৪

সামাজিক কাঠামো ও জ্ঞাতিত্ব : বিয়ে
Social Structure and Kinship: Marriage

এই ইউনিটের চারটি পাঠ রয়েছে। তিনটি পাঠ বিয়ে এবং অজাচারকে কেন্দ্র করে; সর্বশেষ পাঠের বিষয়বস্তু হচ্ছে, সাম্প্রতিককালের জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন। অজাচারের প্রসঙ্গ বহু নৃবিজ্ঞানীর বিশেষ মনোযোগের জায়গা ছিল; এটির কারণ সম্ভবত এর বিশ্বব্যাপী প্রচলন (অজাচারের ধারণা যেহেতু সকল সমাজে রয়েছে)। নৃবিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা ছিল; এটির কারণ কি? এই নিষেধাজ্ঞা কি মনুষ্যত্বের কিংবা সংস্কৃতির (যেহেতু প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই সংস্কৃতি রয়েছে) চিহ্ন? এটিই কি তাহলে প্রাণীসকলের মধ্যে মানুষকে বিশিষ্টতা দান করে? এধরনের যুক্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে নৃবিজ্ঞানীরা বিশ্বজনীন তত্ত্ব দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। কিছু কিছু নৃবিজ্ঞানী এই তত্ত্ব নিমার্ণে মনোবিজ্ঞান, দৈহিক নৃবিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞানের সাহায্য নেন। আর কিছু কিছু নৃবিজ্ঞানী এর নিরেট সামাজিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। একই ধরনের প্রচেষ্টা বিয়ের প্রসঙ্গেও ঘটতে দেখা যায়। কিছু নৃবিজ্ঞানী দাবি করেন যে স্বামী ও স্ত্রীর যৌন মিলনের সামাজিক স্বীকৃতি, এবং সন্তানের বৈধতা – এ দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বজনীন। তাঁদের এই দাবি ধোপে টেকেনি। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, গত দুই দশকে যে নয়া ধারার জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন গড়ে উঠেছে সেখানে নৃবিজ্ঞানীদের সাথে ইতিহাসবিদ, সংস্কৃতি-অধ্যয়নকারী, সাহিত্য-অধ্যয়নকারী এবং সর্বোপরি, গোষ্ঠীগতভাবে নারীবাদীরা জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমালোচনামনস্ক কাজ তৈরী করছেন। এই কারণে নৃবিজ্ঞানের বাইরের দু'জনার কাজ (তাঁরা দুজনই ইতিহাসবিদ) এই ইউনিটের ১ নম্বর পাঠে কেস স্টাডি মারফত উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে কেবলমাত্র জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন কিংবা নৃবিজ্ঞান নয়, অপরাপর জ্ঞানকান্ডেরও মৌলিক কিছু জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে হয়েছে, হচ্ছে। জিজ্ঞাসাগুলোর মিল রয়েছে, যেমন – এই জ্ঞানকান্ডের জ্ঞানগত ভিত্তি কি? এর জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি কি? এই জ্ঞানকান্ডের মূলগত পূর্বানুমান কি? কিছু নৃবিজ্ঞানী মনে করেন এ ধরনের জিজ্ঞাসা জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের ভিত্তিমূলকে খানখান করে ফেলেছে। তার কারণ যাঁরা প্রশ্ন করছেন তাঁদের বিশ্লেষণ হ'ল, এ পর্যন্ত অনুশীলিত জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন কেবলমাত্র পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক নয়, এটি পাশ্চাত্যীয় আধিপত্যের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। তবে, তাঁরা এও মনে করেন যে, জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের এই উন্মোচন এই বিশেষজ্ঞ জ্ঞানকে ভবিষ্যতে অর্থবহ করে তুলবে, এবং তীক্ষ্ণ ও ধারালো বিশ্লেষণ তৈরিতে সাহায্য করবে। এসব বিষয় এ ইউনিটের সর্বশেষ পাঠ "সাম্প্রতিককালের জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন"-এ আলোচিত হয়েছে।

- ♦ পাঠ - ১ : বিয়ে: ধারণা এবং সংজ্ঞা
- ♦ পাঠ - ২ : অজাচার
- ♦ পাঠ - ৩ : বিয়ের ধরন
- ♦ পাঠ - ৪ : সাম্প্রতিককালের জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন

পাঠ - ১

বিয়ে : ধারণা এবং সংজ্ঞা
Marriage: Concept & Definition

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- নৃবিজ্ঞানীরা কিভাবে বিয়ের বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন
- কিভাবে বিশ্বের সাংস্কৃতিক বিবিধতা এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে
- বিয়ে হচ্ছে একটি ইতিহাস-নির্দিষ্ট সম্পর্ক

বিয়ের কোন বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানো সম্ভব নয়

নৃবিজ্ঞানের লক্ষ্য যদি হয়ে থাকে মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে জানা, তাহলে জরুরী হয়ে পড়ে সমাজে সমাজে ভিন্নতা, এক কাল হতে আরেক কালের পার্থক্য – এই বিষয়গুলোকে ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রে রাখা।

বিয়ের এমন কোন সংজ্ঞা দাঁড় করানো সম্ভব নয় যা কিনা সকল স্থান এবং সকল সময়কালের জন্য প্রযোজ্য। বিগত প্রায় একশ' বছর ধরে সমাজ বিজ্ঞানীরা বিয়ের একটি সর্বকালব্যাপী, এবং সর্বস্থানের জন্য প্রযোজ্য – এক কথায় বললে, "বিশ্বজনীন"(universal) – সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীদের এই প্রচেষ্টার অগ্রভাগে ছিলেন নৃবিজ্ঞানীরা। কিন্তু হাল আমলের ভাবনা হচ্ছে, এ ধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ ধরনের প্রচেষ্টায় প্রাধান্য পায়, হয় "নিজ" সমাজের অথবা নৃবিজ্ঞানীর কাছে বহুল পরিচিত কিছু সমাজের, বিয়ে ব্যবস্থা। এসব সমাজ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিয়ে সংক্রান্ত তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়। এতে সমস্যা তৈরী হয়। এভাবে ভাবনা চিন্তা করলে কোনমতেই এ বিষয়ে বিদ্যমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা (cultural differences) বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অন্য কথায়, বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টা ক্ষেত্র বিশেষে পৃথিবীর মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এ ধরনের প্রচেষ্টায় ধরে নেয়া হয় যে, বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ইতোমধ্যেই আমরা যা কিছু জানি, তা পর্যাপ্ত। অন্য কোন কিংবা ভিন্ন কোন সমাজ সম্বন্ধে পাওয়া তথ্য "সংযোজন" মাত্র। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কোন কোন সমাজের বিয়ের প্রথাকে দেখা হয় "ব্যতিক্রম" অর্থে, এবং মূলধারার আলোচনায় এই ভিন্নতাগুলোকে সমান গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করা হয় না। কিন্তু, নৃবিজ্ঞানের ঘোষিত লক্ষ্য যেহেতু মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে জানা, সেকারনে জরুরী হয়ে পড়ে সমাজে সমাজে ভিন্নতা, এক কাল হতে আরেক কালের পার্থক্য – এই বিষয়গুলোকে ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রে রাখা। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই সাম্প্রতিককালের নৃবিজ্ঞানীরা বিশ্বব্যাপী সংজ্ঞা দাঁড় করানোর উপর আর জোর দিচ্ছেন না। বরং গুরুত্ব দিচ্ছেন নির্দিষ্টতার (specificity) উপরঃ তারা জানতে চাচ্ছেন, বুঝতে চাচ্ছেন নির্দিষ্ট কোন সমাজে, নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর মাঝে, নির্দিষ্ট সময়কালে কি ধরনের বিয়ে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বা আছে।

বিগতকালে, কিছু নৃবিজ্ঞানী বিয়ের একটি বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, সকল সমাজে বিয়ে, আকর (core) কিছু কার্য (function) সম্পাদন করে। তাদের মতে (ক) যৌনতা নিয়ন্ত্রণ এবং (খ) সন্তানের বৈধতা প্রদান – এদুটো কার্য সম্পাদন বিয়েকে দান করে এক বিশ্বজনীন রূপ। উইলিয়াম গুডএনাফ-এর মতে (১৯৭০), বিয়ে হচ্ছে একটি চুক্তি যার মাধ্যমে একজন নারীর যৌনতার উপর অধিকার সৃষ্টি করা হয়। নৃবিজ্ঞানী ক্যাথলিন গফ-এর মতে (১৯৫৯), সন্তানের বৈধতা নির্ধারণ বিয়ে নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সর্বজনীনতা প্রদান করে থাকে। তার মানে, গফ বলতে চাচ্ছেন, বিয়ের মাধ্যমে একজন নারী এবং একজন পুরুষের যৌন মিলন সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। এই যৌন মিলনের ফলে ভূমিষ্ট সন্তান বৈধ সন্তান হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু, গফ বিয়ের অর্থ যেভাবে দাঁড় করাচ্ছেন – বৈধ সন্তান নিশ্চিত করা হচ্ছে বিয়ে নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্য, *এবং* এ কার্য সম্পাদন বিয়েকে করে তোলে বিশ্বজনীন – সেটা সকল সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সুদানের **নুয়ের** সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে 'ভূত বিবাহ' (ghost-marriage) এবং নারী-নারী (woman-woman marriage) বিবাহ প্রচলিত। ভূত বিবাহ বলা হচ্ছে সে ধরনের বিয়েকে যেখানে একজন বিধবা হয় পুনরায় বিয়ের মাধ্যমে, অথবা প্রেমিক গ্রহণের সাহায্যে, মা হন। নবজাতক সন্তানটি স্বীকৃতি পায় মৃত স্বামীর বৈধ সন্তান হিসেবে – তার নতুন স্বামী অথবা প্রেমিকের বংশধর হিসেবে না। নুয়েরদের মাঝে

আরেক ধরনের বিয়ের প্রচলন আছে, যা কিনা 'নারী-নারী বিবাহ' হিসেবে নৃবিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত: এ বিয়ের মাধ্যমে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। বয়োকনিষ্ঠ নারী বিয়ের পর স্বাধীনভাবে প্রেমিক গ্রহণ করতে পারেন। প্রেমিকের সাথে শারীরিক মিলন সূত্রে যে সন্তানেরা জন্মায় তাদের ধরা হয় "স্বামী"র (বয়োজ্যেষ্ঠ নারী) পিতৃকূলের সদস্য হিসেবে।

খুব স্পষ্টতই, নুয়ের সমাজের বিয়ের এ দুই ধরন, বিয়ের সর্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর বহু প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে তোলে। আবার বাঙ্গালী হিসেবে আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণাকেও ধাক্কা দেয়। একমাত্র বিয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেবে সমাজের চোখে সন্তান বৈধ হিসেবে স্বীকৃত হবে কিনা – এই ধারণা নুয়ের সমাজের ভূত বিবাহের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই খাটে না। বিয়ের মানে বৈধ সন্তান – বিষয়টাকে নুয়ের জনগোষ্ঠী এভাবে দেখেন না। কারণ, সে সমাজে, একজন বিধবা নারীর পুনরায় বিয়ে করার পরও তার পরবর্তী স্বামীর ঔরসজাত সন্তান তার পূর্বতন/মৃত স্বামীর বংশধর। আরও উল্লেখ্যযোগ্য, মৃত স্বামীর বৈধ বংশধর হিসেবে স্বীকৃতি পাবার জন্য সন্তানের মার বিয়ে করা বাঞ্ছনীয় নয়। বিয়ে না করে তিনি যদি প্রেমিকের সাহায্যে সন্তান লাভ করেন, সেই সন্তানও মৃত স্বামীর বৈধ সন্তান হিসেবে স্বীকৃত।

বিয়ের মানে বৈধ সন্তান – বিষয়টাকে নুয়ের জনগোষ্ঠী এভাবে দেখেন না।

নুয়ের সমাজের নারী-নারী বিবাহের যে প্রচলন রয়েছে – সেখানে তিনটি বিষয় লক্ষ্যণীয়: প্রথমত, একজন নারী এবং একজন পুরুষ নয়, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন দুইজন নারী। এখানে উল্লেখ করা জরুরী যে, বর্তমানে পত্র-পত্রিকায় "সমকামী" সম্পর্ক বলতে যা বোঝানো হয়ে থাকে, এটা কিন্তু তা নয়। একই লিঙ্গের মাঝে কামনার সম্পকর্কে সমকামিতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। সমকামিতার দরুন কিন্তু দুই নুয়ের নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিতে ধরে নেয়া হয় পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থায় শুধুমাত্র পুরুষের মাধ্যমেই বংশ বৃদ্ধি হয়। নারীর ভূমিকা এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় কিংবা গৌণ। কিন্তু নুয়েরদের বিয়ের এই প্রথা এ ধরনের পুরুষালী ধারণাকে ধাক্কা দেয়। নুয়েরদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, নারী-নারী বিবাহ বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে পিতৃকূলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৃতীয়ত, নুয়েরদের বিবাহ প্রথার সাথে গুডএনাফের সংজ্ঞা খাপ খায় না। ভূত বিবাহ প্রথা অথবা নারী-নারী বিবাহ প্রথা, কোনটার ক্ষেত্রেই বলা সম্ভব নয় যে বিয়ের অর্থ হচ্ছে নারীর যৌন ক্ষমতার উপর কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা। একজন বিধবা নুয়ের নারী বিয়ে না করেও প্রেমিক গ্রহণ করতে পারেন। সেটা সামাজিকভাবে স্বীকৃত। নুয়েরদের নারী-নারী বিবাহের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, নারীর যৌনতায় অধিকার প্রতিষ্ঠা এ ধরনের বিবাহ প্রথার প্রধান কার্য বা function না।

ভূত বিবাহ প্রথা অথবা নারী-নারী বিবাহ প্রথা, কোনটার ক্ষেত্রেই বলা সম্ভব নয় যে বিয়ের অর্থ হচ্ছে নারীর যৌন ক্ষমতার উপর কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা।

ঠিক একইভাবে, ভারতের মাতৃতান্ত্রিক **নায়ার** সমাজের বিবাহ প্রথা বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর প্রচেষ্টাকে সংকটাপন্ন করে তোলে। একজন নায়ার মেয়েকে একজন পুরুষের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে দেয়া হয় কিন্তু বিয়ের পর মেয়েটি তার স্বামীর সাথে বসবাস করে না, সে তার মাতৃকূলেই থেকে যায়। মেয়েটি চাইলে প্রেমিক গ্রহণ করতে পারেন। সন্তান জন্মালে, সেই সন্তান মায়ের আনুষ্ঠানিক স্বামীর বংশের নয়, অথবা মায়ের প্রেমিকের বংশেরও নয় কিংবা নিজের প্রেমিকের বংশেরও নয়। সন্তানটি হয় নিজ মায়ের বংশের সদস্য।
এ সকল কারণে নৃবিজ্ঞানী এডমান্ড লীচ্ বিয়ের বিশ্বজনীন সংজ্ঞার সমালোচনা করছেন। যেমন ধরুন, এ ধরনের সংজ্ঞা: "Marriage is a union between a man and a woman such that children born to the woman are the recognized legitimate offspring of both partners." (বিয়ে হচ্ছে একজন নারী এবং একজন পুরুষের মিলন। এই মিলনের ফলে যে সকল সন্তান জন্ম লাভ করে, তারা দুইজনেরই [স্বামী এবং স্ত্রী] বৈধ সন্তান হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে)। লীচ প্রশ্ন তুলেছেন: শুধু মাত্র একটি গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে কি পৃথিবীর সকল বিয়ের অর্থ, কিংবা কার্য, আদৌ বোঝা সম্ভব? উদ্ধৃত সংজ্ঞায় স্পষ্টতই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (আবারও) সন্তানের বৈধতা – এই একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের উপর। পক্ষান্তরে লীচ প্রস্তাব করছেন যে, বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনকে আমরা দেখতে পারি দুই পক্ষের মাঝে নির্দিষ্ট কিছু "অধিকার গুচ্ছ" (classes of right) তৈরি হওয়া হিসেবে। এই অধিকার গুচ্ছের মধ্যে রয়েছে একজন পুরুষ (পিতা) অথবা নারীর (মাতা) সন্তানের বৈধতা প্রতিষ্ঠা, রয়েছে বিবাহ সঙ্গীর (স্বামী কিংবা স্ত্রী) যৌন ক্ষমতার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা। রয়েছে গৃহী (domestic) কিংবা শ্রম সেবার (labour services) উপর অধিকার সৃষ্টি। এই অধিকার গুচ্ছ হতে পারে যৌথ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত, অথবা বিবাহ সঙ্গীর – তার মানে স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রীর আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামীর – সম্পত্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা। আবার এমনও হতে পারে যে বিয়ের সম্পর্কের অর্থ হচ্ছে শুধু স্বামী নয়, স্বামীর ভাইদের সাথেও বিবাহের সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া। লীচ আরও বলছেন, এই তালিকা কোন ভাবেই পূর্ণাঙ্গ নয়। হয়তো বা গবেষণা চলাকালীন অবস্থায় নৃবিজ্ঞানী বুঝবেন যে, নির্দিষ্ট কোন সমাজে বিয়ের অর্থ হচ্ছে অন্য কোন কার্য সম্পাদন। লীচ আরও বলেন, কোন একটি নির্দিষ্ট

লীচের পরামর্শ হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট সমাজে বিয়ের সম্পর্ক সমাজের অপরাপর সম্পর্কের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা উদ্‌ঘাটন করা।

সমাজে সকল বৈশিষ্ট্য যে একই সাথে বিদ্যমান থাকবে, তাও নয়। নির্দিষ্ট কোন সমাজে নৃবিজ্ঞানী একটি কিংবা একাধিক অধিকার গুচ্ছ পাবেন। পরিশেষে তিনি বলছেন,"বিয়ে বলতে যে প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়ে থাকে, সকল সমাজে এর একই ধরনের সামাজিক কিংবা আইনী আনুষঙ্গিক ব্যাপার-স্যাপার থাকবে, তা কিন্তু নয়"। লীচের পরামর্শ হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট সমাজে বিয়ের সম্পর্ক সমাজের অপরাপর সম্পর্কের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা উদ্‌ঘাটন করা।

এ অব্দি আলোচনা হয়েছে বিয়ের সর্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর সমস্যা নিয়ে। মূল বক্তব্য হচ্ছে এ পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানীদের যাবতীয় চেষ্টা কম বেশি ব্যর্থ হয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে। বিয়ের অর্থবহ এবং সকল স্থান-কালের জন্য প্রযোজ্য সংজ্ঞা দাঁড় করাতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছেন, এমন কোন "কার্য" নেই যা জোর দিয়ে বলা যাবে সকল সমাজের, সকল সময়ের বিয়ের ক্ষেত্রেই সত্য। এ কারণেই সাম্প্রতিককালের নৃবিজ্ঞানীরা সর্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজে, বিশেষ কোন সময়কালে বিয়ের কি ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেটা বোঝার উপরই গুরুত্ব দিচ্ছেন।

বিয়ে হচ্ছে একটি ইতিহাস-নির্দিষ্ট সম্পর্ক

বর্তমানের ইতিহাস-নির্দিষ্টতার ধারণা, উনবিংশ শতকের বিবর্তনবাদীদের ধারণা হতে ভিন্ন।

৩ নম্বর ইউনিটের ৩ নম্বর পাঠে আপনি পরিচিত হয়েছেন পারিবারিক সম্পর্ক হচ্ছে ইতিহাস-নির্দিষ্ট - এই তাত্ত্বিক প্রস্তাবনার আলোকে সংগঠিত সাম্প্রতিককালের কাজের ধারার সাথে। আপনি এও জেনেছেন যে, ইদানিং কালে নৃবিজ্ঞানে ইতিহাস-নির্দিষ্ট কাজের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। পুনরাবৃত্তিমূলক হলেও বিষয়টি আবারও উল্লেখ করছি, বর্তমানের ইতিহাস-নির্দিষ্টতার ধারণা, উনবিংশ শতকের বিবর্তনবাদীদের ধারণা হতে ভিন্ন। তারা ধরে নিয়েছিলেন যে একটি রৈখিক বিশ্বব্যাপী ইতিহাস রচনা সম্ভব। বিবর্তনবাদী চিন্তা যে বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে সেগুলো আপনি ইতোমধ্যেই ৩ নম্বর ইউনিটের ২ নম্বর পাঠে জেনেছেন। হাল আমলের পারিবারিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে যে ইতিহাস-নির্দিষ্ট গবেষণা কাজ হচ্ছে, তার একটি শক্তিশালী উদাহরণ আমরা পাই লিওনর ডেভিডফ এবং ক্যাথরিন হলের কাজে। এই দুই ইংরেজ নারীবাদীর লেখা *ফ্যামিলি ফরচুনস্: মেন এ্যান্ড উইমেন অফ দি ইংলিশ মিডেল ক্লাস, ১৭৮০-১৮৫০* নামক গ্রন্থে। বইটি বহু মহলে একটি দিক-নির্দেশনাকারী কাজ হিসেবে নন্দিত হয়েছে। যদিও তাঁরা দুইজন ইতিহাসবিদ, তাঁদের গবেষণা কাজ বহু নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীদের উদ্বুদ্ধ করেছে (উদাহরণস্বরূপ, হিলারী স্ট্যান্ডিং, যার কাজ কেস স্টাডি আকারে আলোচিত হয়েছে ৩ নম্বর ইউনিটের ৩ নম্বর পাঠে)। খোদ নৃবিজ্ঞানে ইদানিং কালে ইতিহাসের প্রতি ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে তাঁদের কাজের প্রতি নৃবিজ্ঞানীদের আগ্রহের জন্ম হয়েছে। এই পাঠের বাকী অংশে রয়েছে দুটি কেস স্টাডি। কেস স্টাডি দুটি তৈরি করা হয়েছে ডেভিডফ এবং হলের *ফ্যামিলি ফরচুনস্*, এবং ক্যাথরিন হলের লিখিত *হোওয়াইট, মেইল এ্যান্ড মিডেল ক্লাস। এক্সপে- ারেশানস্ ইন ফেমিনিজম এ্যান্ড হিস্টরি*, এ দুটির ভিত্তিতে। প্রথম কেস স্টাডির প্রধান বিষয় হচ্ছে, ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া শ্রেণীর লিঙ্গায়িত রূপ এবং কিভাবে ইভানজেলিকেল (Evangelical) ধর্মীয় মতবাদ এবং আন্দোলন বুর্জোয়া নারী-সত্তা গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় কেস স্টাডির বিষয় হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারীর 'গৃহিণী' রূপে আবির্ভাব। ক্যাথরিন হল্ তাঁর বইয়ের একটি প্রবন্ধে গৃহিণীর ইতিহাস উদ্ঘাটন করেছেন এবং এই কেস স্টাডি তার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

ডেভিডফ এবং হলের একটি কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা হচ্ছে, শ্রেণীর গঠন লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নয়। লিঙ্গ হচ্ছে সামাজিক সংগঠনের একটি মূলনীতি। এই মূলনীতির ভিত্তি হচ্ছে যৌন পার্থক্য (sexual difference), এবং এটি সামাজিকভাবে সংগঠিত।

ডেভিডফ এবং হলের একটি কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা হচ্ছে, শ্রেণীর গঠন লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নয়। লিঙ্গ হচ্ছে সামাজিক সংগঠনের একটি মূলনীতি। এই মূলনীতির ভিত্তি হচ্ছে যৌন পার্থক্য (sexual difference), এবং এটি সামাজিকভাবে সংগঠিত। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, মতাদর্শ যৌন পার্থক্যকে নির্মাণ করে; একে প্রতিষ্ঠিত করে। এ মূলনীতি সামাজিক এবং ঐতিহাসিক, এটি ঈশ্বর বা প্রকৃতি প্রদত্ত নয়। ডেভিডফ এবং হল্ বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎপত্তি এবং সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া ইংল্যান্ডের পূর্বতন (সামন্ততান্ত্রিক) লিঙ্গীয় পার্থক্যকে পুনর্গঠিত করে। শিল্প বিকাশের প্রক্রিয়ায় লিঙ্গীয় ভিন্নতার নতুন অর্থ তৈরি হয়: নারীত্বের অর্থ নির্মিত হয় "গৃহী" এবং "নির্ভরশীল" হিসেবে; কল-কারখানার মালিক হিসেবে পুরুষ নির্মিত হন "কর্তা", এবং নির্ভরশীল নারীর (ও তাদের সন্তানদের) 'রক্ষক' ও 'প্রতিপালক' হিসেবে। নারী এবং পুরুষের সামাজিক ভূমিকার পুনঃসংজ্ঞায়ন ইংরেজ সমাজে বিয়ের অর্থ ও গুরুত্বকে পাল্টে দেয়। একই সাথে বিয়ের অর্থ, নারীত্ব ও পুরুষত্বের ধারণাকে মৌলিকভাবে বদলে দেয়। এই পরিবর্তনগুলো প্রথমে বুর্জোয়া শ্রেণীতে ঘটে; পরবর্তী পর্যায়ে, বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তিমত্তা বৃদ্ধির সাথে সাথে, বুর্জোয়া পারিবারিক মতাদর্শ এবং অনুশীলন সমগ্র সমাজে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বুর্জোয়া পারিবারিক জীবন সমাজের মানদন্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেস স্টাডি : ইভানজেলিকেলবাদ এবং নারীর গৃহী-সত্তা নির্মাণ[১]

নারী এবং পুরুষের পৃথকীকরণ ইংল্যান্ডের নব্য বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর জীবনযাত্রার (culture) কেন্দ্রে ছিল। সূচনার মুহূর্ত হতেই শ্রেণী ছিল লিঙ্গায়িত। বুর্জোয়া শ্রেণীর "পুরুষ' এবং "নারী"র পার্থক্য সুনির্দিষ্টভাবে রচিত হয়। নারীত্বের অর্থ কি – তার সামাজিক ভূমিকা কি হওয়া উচিত, নারী-পুরুষের আদর্শ সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, নারী কি করলে বা কি ভাবলে নারীত্বের অবমাননা ঘটে, কোন সামাজিক ভূমিকা পালন হচ্ছে তার নিয়তি – এসব প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডে ১৭৮০-১৮৩০ সময়কালে, বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হয়। এই তর্ক-বিতর্কে বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষ, নারী এবং পুরুষ, গীর্জার পুরোহিত এবং সাধারণ খ্রিস্টান উপাসক, ডাক্তার-মোক্তার, লেখক – এঁদের অংশগ্রহণ ছিল। ঔচিত্যের ধারণা প্রকাশিত হয় বই আকারে, পুস্তিকা আকারে, পত্রিকার সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিতে, ব্যক্তিগত রোজ-নামচায়, গল্প-উপন্যাসে, ছড়ায় ও কবিতায়। ঔচিত্যের ধারণা সভা-সমিতিতে, পাড়া-ভিত্তিক অনুষ্ঠানে, গীর্জার যাজকের বেদী হতে, বিভিন্নভাবে, নানান সময়ে উচ্চারিত হয়। ডেভিডফ এবং হলের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যে, নারীত্ব কি – সেটির সংজ্ঞা ১৮৩০-১৮৪০এর মধ্যে ইংরেজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

নারীত্বের অর্থ কি – তার সামাজিক ভূমিকা কি হওয়া উচিত, নারী-পুরুষের আদর্শ সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, নারী কি করলে বা কি ভাবলে নারীত্বের অবমাননা ঘটে, কোন সামাজিক ভূমিকা পালন হচ্ছে তার নিয়তি – এসব প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডে ১৭৮০-১৮৩০ সময়কালে, বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হয়।

নতুন (বুর্জোয়া) নারীত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় গৃহ এবং পরিবারকে কেন্দ্র করে। নারীর গৃহী সত্তার উপর জোর দেয়া হয়; এই সংজ্ঞা অনুসারে, নারী হচ্ছে প্রধানত "স্ত্রী" এবং "মা"। ডেভিডফ এবং হল (এবং আরও বহু ইতিহাসবিদদের) অভিমত হল, এই সংজ্ঞায়নে ইভানজেলিকেল ধর্মীয় আন্দোলন (ইভানজেলিকেলবাদ খ্রিস্টান ধর্মের একটি উপধারা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৭৮০ হতে ১৮৩০, পঞ্চাশ বছরের এ সময়কালে, ইংল্যান্ডের সমাজে মৌলিক এবং গভীর রূপান্তর ঘটছিল। ইংল্যান্ড রূপান্তরিত হচ্ছিল একটি দাপুটে অভিজাত শ্রেণী এবং বাণিজ্য-ভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজ, যেখানে ভূমি হচ্ছে ক্ষমতার ভিত্তি সেটি হতে একটি শিল্প-ভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজে, যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণী হচ্ছে একচ্ছত্রভাবে অধিপতিশীল। এই রূপান্তরনে ইভানজেলিকেল ধর্মীয় আন্দোলন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। এই ধর্মীয় আন্দোলন মানুষজনের প্রাত্যহিক আচার-আচরণ এবং নীতি-নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইভানজেলিকেলদের দৃষ্টিতে, সংস্কার হতে হবে ভেতর থেকে। ১৭৯২ সালে ইংরেজ নারীবাদী মেরী ওলস্টোনক্রাফটের *এ ভিন্ডিকেশান অফ দ্য রাইটস অফ উইমেন* বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির প্রধান বক্তব্য ছিল, নারীর নিকৃষ্টতা (inferior) প্রতিবেশের কারণে; এটি প্রকৃতি প্রদত্ত নয়। নারী সুযোগ বঞ্চিত। বুর্জোয়া পুরুষ যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে – শিক্ষার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক পরিসরে এবং আইনের দৃষ্টিতে – সেগুলো নারীকেও প্রদান করতে হবে। ওলস্টোনক্রাফটের বক্তব্যের সমালোচনা করেন ইভানজেলিকেলরা; এই ধর্মীয় আন্দোলনে নারীরাও ছিলেন। তাঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল; নারী এবং পুরুষ সমান নয়, তাদের মধ্যকার ভিন্নতা প্রকৃতি-প্রদত্ত। নারীর অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে কিন্তু নারী-শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাল স্ত্রী এবং ভাল মা হওয়া, চাকরি-বাকরী করা বা বহির্জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নয়।

মেরী ওলস্টোনক্রাফটের A Vindication of the Rights of Women বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির প্রধান বক্তব্য ছিল, নারীর নিকৃষ্টতা (inferior) প্রতিবেশের কারণে; এটি প্রকৃতি প্রদত্ত নয়।

ইভানজেলিকেলবাদ "গৃহের ধর্ম" হিসেবে পরিচিত: ধর্ম প্রচারে গৃহ এবং পরিবারের গুরুত্ব অসীম। এই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কেবলমাত্র গৃহ এবং পরিবারকে ঘিরেই সাচ্চা ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে, গৃহে নারী এবং পুরুষের পরিসর ভিন্ন। নারী স্বভাবজাতভাবে কমনীয়, নাজুক, সরল, সহজ এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী। এসকল কারণে, নারীর সতর্ক থাকা, আড়ালে থাকা এবং গৃহের আশ্রয়ে থাকা জরুরী। অপর পক্ষে, পুরুষ হচ্ছে স্বভাবজাতভাবেই বহির্জাগতিক; তার আছে শক্তি, মাহাত্ম্য এবং মান-মর্যাদা। ইভানজেলিকেলরা প্রত্যাশা করতেন যে, নারীর উপস্থিতি পুরুষের নীতি-নৈতিকতা বোধকে জাগ্রত রাখবে, সম্ভব হলে সেটির উন্নতিও ঘটাবে। আরও প্রত্যাশা করতেন যে, নারীর এই বিশেষ গুণ এবং তার প্রভাব কেবলমাত্র তার স্বামীতে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করবে। সমগ্র জাতি সংস্কারের মাধ্যমে নৈতিকভাবে উন্নত হয়ে উঠবে। কিছু ইভানজেলিকেল চিন্তকেরা এ মতও প্রকাশ করেন যে, অল্প শিক্ষিত হওয়ার কারণে, শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে স্বল্প জ্ঞান থাকার কারণে, পুরুষের তুলনায় নারী বেশি ধর্মকেন্দ্রিক। এবং, তাদের দৃষ্টিতে, ধর্মের প্রতি নারীর আগ্রহকে জিইয়ে রাখার জন্য তার গৃহকেন্দ্রিক জীবন জরুরী।

ইভানজেলিকেল দৃষ্টিতে, স্বামীর প্রতি আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাপ্রদত্ত বশ্যতা হচ্ছে একজন স্ত্রীর আবশ্যিক গুণাবলী। বিয়ের সম্পর্কে স্বামী হচ্ছেন কর্তা এবং স্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই তার অধস্তন। স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে

*লিকেল দৃষ্টিতে, স্বামীর
নুগত্য এবং স্বেচ্ছাপ্রদত্ত
্যতা হচ্ছে একজন স্ত্রীর
আবশ্যিক গুণাবলী।*

---

[১] Leonore Davidoff and Catherine Hall, *Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class 1780-1850*, London: Hutchinson, pp. 81-95.

সংসারের দেখাশোনা করা, চাকর-বাকরদের দিয়ে গৃহশ্রম করিয়ে নেয়া, এবং সন্তানদের নৈতিক মূল্যবোধ লালিত-পালিত করা। একজন আদর্শ স্ত্রী হচ্ছেন তার স্বামীর যোগ্য সহচর। নারীদের যেহেতু বিবেচনা করা হত স্বামীর সাপেক্ষে, সে কারণে সে সময়ের নারী পরিচিত হয়ে ওঠেন, একজন "সাপেক্ষিক জীব" (relative creature) হিসেবে, নিজ গুণাবলীতে পরিচিত একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে নয়। বুর্জোয়া শ্রেণী গঠনকালে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয় এবং নারীর সামাজিক মান-মর্যাদা নিরূপণের প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়ায়।

ডেভিডফ এবং হলের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, ইভানজেলিকেল ধর্মীয় আন্দোলনের অবসান ঘটার পর ইংল্যান্ডে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজ গড়ে উঠে ঠিকই, কিন্তু নারী-পুরুষের এই লিঙ্গীয় সত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার ফলে এ ধারণাসকল টিকে যায়।

ক্যাথরিন হলের বক্তব্য হচ্ছে, পুঁজিবাদী সমাজে বিয়ে এবং পরিবার হচ্ছে নারী অধস্তনতা, এবং পুরুষ আধিপত্যের ভিত্তি।

উপরের কেস স্টাডি হতে স্পষ্ট যে, পুঁজিবাদী সমাজের আর্বিভাব নারী সত্তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়, নারীত্বকে নির্মাণ করে "স্ত্রী" এবং "মা" হিসেবে। এই নির্মাণের ভিত্তি হচ্ছে বিয়ে এবং এ কারণেই বিয়ে নারীর জীবনে, তার ভরণপোষণের জন্য, তার পূর্ণতাবোধের জন্য, হয়ে ওঠে অপরিহার্য। নির্ভরশীল নারীর বিপক্ষে পুরুষ প্রতিষ্ঠিত হয় দায়িত্বশীল হিসেবে, স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষক এবং প্রতিপালনকারী হিসেবে। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই পুরুষকেন্দ্রিকতা অধিকতর শক্তি সঞ্চার করে অন্য একটি, কিন্তু যুক্ত, বদলের মধ্য দিয়ে। প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজে গৃহ এবং পরিবার ছিল উৎপাদনের স্থান। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আবাসিক অঞ্চল হতে বহু দূরে কল-কারখানাগুলোকে নির্মাণ করা হয়। অর্থাৎ, পুঁজিবাদের আর্বিভাবের ফলে গৃহ ও পরিবার উৎপাদনের একক হিসেবে তার পূর্বতন গুরুত্ব হারায়। 'গৃহী' সত্তা এবং অধিকতর 'নীতি-নৈতিকতাপূর্ণ' লিঙ্গ হিসেবে নারীত্বের নির্মাণ 'অনুৎপাদনশীল' ভূমিকার সাথে যুক্ত হয়। ফলে, একই সাথে বেশ কয়েকটি জিনিস ঘটে: নারী হয়ে উঠে গৃহিণী, গৃহশ্রম অনুৎপাদনশীল কাজ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দরুন নারী হয়ে উঠে অনুৎপাদক, স্বভাবজাতভাবে গৃহী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দরুন নারী বিয়ের উপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ক্যাথরিন হলের বক্তব্য হচ্ছে, বিভিন্ন আইনী সংস্কার সত্ত্বেও, বিয়ে হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আইনিভাবে একটি বৈষম্যপূর্ণ সম্পর্ক। এ কারণে, পুঁজিবাদী সমাজে বিয়ে এবং পরিবার হচ্ছে নারী অধস্তনতা, এবং পুরুষ আধিপত্যের ভিত্তি। নীচের কেস স্টাডিতে ক্যাথরিন হলের এই বক্তব্যের একটি অংশ – গৃহিণীর ইতিহাস – উপস্থাপন করা হয়েছে।

কেস স্টাডি : ইংল্যান্ডের গৃহিণীর ইতিহাস[২]

পাশ্চাত্য সমাজে "গৃহিণী" (housewife) শব্দের বিশেষ অর্থ রয়েছে। গৃহিণী মাত্রই নারী; গৃহিণী বলতে সাধারণভাবে বোঝা হয়ে থাকে এমন একজন নারী যার কাজ হচ্ছে একটি গৃহকে সংগঠিত করা, এবং সেটিকে গৃহস্থালী (household) রূপে বজায় রাখা। সংসারের ধোয়াধুয়ির কাজ, রান্না করা, পরিষ্কার করা এবং প্রাক্-স্কুলবয়সী সন্তানদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করা হচ্ছে একজন গৃহিণীর কাজ। সংক্ষেপে বললে, একজন গৃহিণীর দায়িত্ব হচ্ছে তার স্বামী এবং সন্তানদের গৃহী সেবা প্রদান করা। গৃহিণীর কাজ হচ্ছে মজুরিবিহীন। পুঁজিবাদী সমাজে পুরুষের/স্বামীর কাজ হচ্ছে মজুরি যুক্ত। আশা করা হয়ে থাকে যে, সেই মজুরি একজন শ্রমিক/চাকুরিজীবী, এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের খরচ মেটাবে। ক্যাথরিন হল্ বলেন, মজুরি ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠার সাথে সাথে "কাজ"এর সংজ্ঞা পাল্টে যায়। নতুন সংজ্ঞায়নে, কাজ হচ্ছে সেই শ্রম যেটির বিনিময়ে টাকা (বেতন, মজুরি, পারিশ্রমিক-আকারে) পাওয়া যায়। যে সকল কাজ কোন অর্থ আয় করে না – যেমন গৃহী শ্রম – সেটিকে "কাজ" হিসেবে বিবেচনা করা হয় না; সেটি, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে, মূল্যহীন কিংবা "অন-অর্থনৈতিক" হিসেবে বিবেচিত হয়। গৃহিণীর কাজ পারিশ্রমিকবিহীন হওয়ার কারণে, এটির কোন সামাজিক মর্যাদা বা মূল্য নেই। হল বলেন, ইংল্যান্ডের কোন গৃহিণীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কি করেন, সাধারণত তার উত্তর হয় এরূপ, "ওহ, আমি তো শুধুমাত্র গৃহিণী"। কিংবা, "না, আমি তো কোন কাজ করি না। আমি একজন গৃহিণী"। কিন্তু ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, নারীর কাজ সবসময় এত মূল্যহীন ছিল না।

চৌদ্দ শতকের ইংল্যান্ডে গৃহিণীর অর্থ ছিল ভিন্ন। তখন, কৃষিভিত্তিক গৃহস্থালীতে এবং শহরেও, খোদ পরিবার ছিল উৎপাদনের একটি একক (productive unit)। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের স্থান হয়ে ওঠে কলকারখানা, মিল-

চৌদ্দ শতকে একজন
গৃহী কাজ এবং সন্তান
পালন করতেন, এবং
তখনও ছিল মজুরিবি
হল্ জোর দিয়ে বলেন
কর্ম-পরিসর এবং কা
তালিকা বুর্জোয়া নারী
পরিসীমিত ছিল না।
বহু নারী ভিন্ন ভিন্ন ধর
করতেন। মদ বানানে
মূলের চাষ-বাস, শন
কাজ, এবং দেশজ ঔ
জ্ঞানের সাহায্যে পরিব
সদস্যদের শরীর-স্বাস্থ্য

---

[২] Catherine Hall, "The History of the Housewife," in *White, Male and Middle Class. Explorations in Feminism and History*, London: Polity Press, 1992, pp. 43-71.

ফ্যাক্টরি এবং অফিস। গৃহ এবং পরিবারের চৌহদ্দি থেকে 'কাজ' সরে যাওয়ার ফলে, এবং গৃহী কাজ 'অন-অর্থনৈতিক' হিসেবে সংজ্ঞায়িত হওয়ার ফলে, পরিবার এবং গৃহ হয়ে পড়ে আবেগ-অনুভূতি এবং নিরেট ভালবাসার জায়গা, এবং বাজার থেকে কিনে আনা দ্রব্যাদি ভোগের জায়গা (রুটি-আলু, মাছ-মাংস, পোশাক-আশাক)। চৌদ্দ শতকের প্রাক-শিল্পভিত্তিক পরিবার ছিল স্বনির্ভর এবং গৃহী কাজ বলতে বোঝাত নানান ধরনের কাজ। কাজের পরিসীমা ছিল আরও ব্যাপকতর। সে সময়ের পরিবারে প্রতিটি ব্যক্তির শ্রম ছিল পরিবারের সামগ্রিক শ্রমের অংশ। চৌদ্দ শতকে একজন গৃহিণী গৃহী কাজ এবং সন্তান লালন-পালন করতেন, এবং এই কাজ তখনও ছিল মজুরিবিহীন। কিন্তু, হল্ জোর দিয়ে বলেন, তার কর্ম-পরিসর এবং কাজের তালিকা বুর্জোয়া নারীর মতন পরিসীমিত ছিল না। অতীতে, বহু নারী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ করতেন। মদ বানানো, ফল-মূলের চাষ-বাস, শন কাটার কাজ, এবং দেশজ ঔষধি জ্ঞানের সাহায্যে পরিবারের সদস্যদের শরীর-স্বাস্থ্য পরিচর্যা – এসব কাজ নারীর কাজ হিসেবে বিবেচিত হত। লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এই বিভাজন ছিল আরও নমনীয়; পুরুষের শ্রম ক্ষমতা নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঠিক যেমন নারীরটিও পুরুষের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনশীল কাজে একজন নারীর অংশগ্রহণ তার স্বামীর উপর নির্ভর করত না; উৎপাদনশীল কাজের সাথে একজন গৃহিণী নারীর যুক্ততা, এবং এতে অংশগ্রহণ, ছিল প্রত্যক্ষ। সচ্ছল কৃষক গৃহস্থালীর নারীরা নিজ গৃহে কাজ করতেন, গরীব নারীরা অভিজাত পরিবার অথবা ধনী কৃষক পরিবারে কাজ করতেন, গৃহ ছিল একই সাথে কাজের এবং বসবাসের স্থান।

চিত্র ১ : ইংল্যান্ডের গৃহিনীর শ্রম

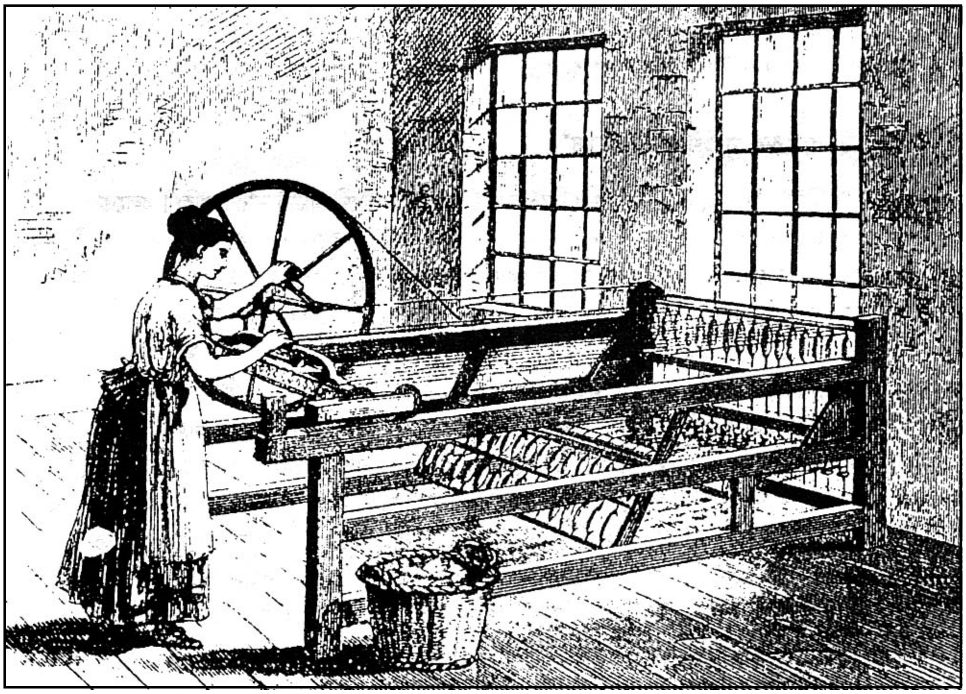

যান্ত্রিক উদ্ভাবনের কারণে কাপড় বোনার কাজ ধীরে-ধীরে গৃহ থেকে অপসারিত হয়। উপরে ইংল্যান্ডের ১৮ শতকের একটি চিত্র।

সহ্ন+ : *Marvin Perry, Myrna Chase, James R. Jacob and Theodore H. Von Laue, (1992) Western Civilization. Ideas, Politics & Society,. From the 1400s, Boston : Houghton Mifflin Company,* পব্ধ(া : ৪৮৪.

পুঁজিবাদের উৎপত্তি গৃহকে করে তোলে কেবলমাত্র বসবাসের স্থান; অফিস, কল-কারখানা থেকে ঘরে ফেরা ক্লান্ত শিল্পপতি/পেশাজীবী স্বামীর বিশ্রামের জায়গা। নারী তার উৎপাদনের ক্ষমতা হারায়, তার ভূমিকা হয়ে উঠে স্বামীর বিশ্রাম ও আরাম-আয়েশ নিশ্চিত করা, এবং তাদের সন্তানদের আগামীদিনের যথোপযুক্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

এই পাঠের আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট: প্রথমত, ইদানিংকালে নৃবিজ্ঞানীরা বিয়ের বিশ্বজনীন রূপ উদঘাটনের প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে এর ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতার উপর গুরুত্বারোপ করছেন। দ্বিতীয়ত, নৃবিজ্ঞানীরা একইসাথে বিয়েকে বৃহত্তর প্রক্রিয়া – অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, মতাদর্শিক – হতে বিচ্ছিন্ন করে না দেখে, এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটনের উপর গুরুত্বারোপ করছেন। উপরোক্ত দুটি কেস স্টাডি এই ধারার কাজের প্রতিনিধিত্ব করে।

সারাংশ

প্রায় একশ' বছর ধরে নৃবিজ্ঞানীরা বিয়ের একটি বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টায় রত ছিলেন। এই কাজে সমাজ বিজ্ঞানীরাও সহায়তা করেন। তাঁদের এই যৌথ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিয়ের নির্যাস হিসেবে তাঁরা যা কিছু চিহ্নিত করেছেন – যেমন ধরুন, নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণ, সন্তানদের বৈধতা প্রদান – তা পৃথিবীর কোন না কোন সমাজের ধ্যানধারণা এবং অনুশীলন দ্বারা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়। ১৯৬০-এর দশক হতে নৃবিজ্ঞানে 'নির্দিষ্টতার' উপর গুরুত্বারোপ করার প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে অনুভূত হয়। বৈশ্বিক ইতিহাস রচনা করার চাইতে, নির্দিষ্ট কোন সমাজের নির্দিষ্ট ইতিহাস রচনা করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপলব্ধ হয়। সমাজতান্ত্রিক/মার্ক্সবাদীরা ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতার সাথে সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এর বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ, কিভাবে পুঁজিবাদ 'আকর' পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে বিবেচিত দেশগুলোতে আমূল সামাজিক বদল ঘটিয়েছে, কিভাবে পুঁজিবাদ অপাশ্চাত্যের সমাজকে রূপান্তরিত করেছে – এসব প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করেন। এই তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা বিয়ের প্রসঙ্গে লিঙ্গীয় এবং শ্রেণী সত্তা, এদের অন্তর্প্রবিষ্টতা, পুরুষের আধিপত্য এবং নারীর অধস্তনতা, এবং সামগ্রিক ব্যবস্থার বদল (যেমন ধরুন, পুঁজিবাদের আর্বিভাব) – এসব প্রসঙ্গকে কেন্দ্রে নিয়ে আসা জরুরী মনে করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। নিচের কোন সমাজে 'ভুত বিবাহ' (Ghost Marriage) প্রচলিত ছিল?

ক. নায়ার	খ. নুয়ের
গ. সামোয়া	ঘ. দবু

২। মাতৃতান্ত্রিক নায়ার সম্প্রদায় বিশ্বের কোন দেশে দেখা যায়?

ক. ভারত	খ. সোমালিয়া
গ. নাইজেরিয়া	ঘ. ঘানা

৩। "পুঁজিবাদী সমাজে বিয়ে এবং পরিবার হচ্ছে নারী অধস্তনতা এবং পুরুষ আধিপত্যের ভিত্তি" - উক্তিটি কার?

ক. ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ	খ. মার্গারেট মিড
গ. তালাল আসাদ	ঘ. ক্যাথরিন হল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ভূত বিবাহ কী? কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের বিয়ে প্রচলিত?

২। ইভানজেলিকেলবাদ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভিন্নতা বিয়ের বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে তুলেছে। আলোচনা করুন।

২। বিয়ে হচ্ছে একটি ইতিহাস-নির্দিষ্ট সম্পর্ক। লিওনর ডেভিডফ এবং ক্যাথরিন হলের কাজের সাহায্যে এই বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করান।

পাঠ - ২

অজাচার
Incest

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- অজাচার কি
- অজাচারের বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর সমস্যা
- অজাচারের উৎস সংক্রান্ত প্রথাগত নৃবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা
- অজাচার সম্বন্ধে লেভি স্ট্রসের ব্যাখ্যা

সকল সমাজে অজাচার ধারণা বিদ্যমান, অর্থাৎ, কিছু কিছু জ্ঞাতিসম্পর্কের মধ্যে যৌনমিলন নিষিদ্ধ। ...তবে, কোন্ কোন্ জ্ঞাতির মধ্যে যৌনমিলন ঘটলে তাকে অজাচার বলা হবে, সেই ধারণা সকল সমাজে এক রকম নয়।

কিছু জ্ঞাতি সম্পর্ক আছে যাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। কড়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি এ ধরনের সম্পর্কের মধ্যে যৌনমিলন ঘটে, তাকে অজাচার (incest) বলা হয়। সকল সমাজে অজাচার ধারণা বিদ্যমান, অর্থাৎ, কিছু কিছু জ্ঞাতিসম্পর্কের মধ্যে যৌনমিলন নিষিদ্ধ। সেই অর্থে, অজাচারের ধারণা বিশ্বব্যাপী (universal)। তবে, কোন্ কোন্ জ্ঞাতির মধ্যে যৌনমিলন ঘটলে তাকে অজাচার বলা হবে, সেই ধারণা সকল সমাজে এক রকম নয়। যৌনমিলনের নিষেধাজ্ঞা এবং বিবাহ-সঙ্গীর নিষেধাজ্ঞা, এ দুটো ভিন্ন জিনিস, এবং এ ব্যাপারে প্রথমেই স্পষ্ট হওয়া জরুরী। ভিন্নতা এই যে, বিবাহের জন্য নিষিদ্ধ এমনও জ্ঞাতি থাকতে পারে যাদের সাথে যৌনমিলন ঘটলে তা অজাচার হিসেবে বিবেচিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কিছু সমাজে আড়াআড়ি বিয়ে নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি ফুপাত ও মামাত ভাই বোনের মধ্যে যৌনমিলন ঘটে, সেটি অজাচার হিসেবে বিবেচিত হয় না। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সামাজিকভাবে আরেকটি ধারণার প্রচলন দেখা যায়: অ-মানানসই মিলন (mis-mating)। এটি কী সে ব্যাপারেও স্পষ্ট হওয়া জরুরী কারণ তা না হলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলোকে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। নৃবিজ্ঞানীরা অ-মানানসই মিলন বলতে সে ধরনের মিলন, বা যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠাকে বোঝান, যা অনুমোদিত নয় কারণ সেগুলো সামাজিক দৃষ্টিতে মানানসই নয়। কিন্তু এ ধরনের মিলন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কোনভাবেই অজাচারের ধারণার সাথে সম্পর্কিত নয়।

নৃবিজ্ঞানের জন্মলগ্ন হতে বহু নৃবিজ্ঞানী অজাচারের প্রসঙ্গে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং অজাচারের উৎস নিয়ে নানান নৃবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করান। ব্যাখ্যাগুলো খুব ভিন্ন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী-ও।

বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানোর সমস্যা

সাধারণভাবে গৃহীত অজাচারের সংজ্ঞায় নৈকট্যের ওপর জোর দেয়া হয়েছে: নিকট আত্মীয়ের মধ্যে যৌন মিলন ঘটলে তা অজাচার। এই ধারণাটিও বাস্তবতার সাথে মেলে না। এমনও সমাজ রয়েছে যেখানে বৃহৎ আত্মীয়কুলের মধ্যে যৌন মিলন নিষিদ্ধ। যদি ঘটে, তা অজাচার হিসেবে বিবেচিত।

সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে, নিকট আত্মীয়, যথা মাতা-পুত্র, পিতা-কন্যা, ভাই-বোন, এদের মধ্যে যৌনমিলন নিষিদ্ধ, এবং এই নিষেধাজ্ঞা বিশ্বব্যাপী। কিন্তু সাধারণ এই ধারণা বাস্তবের সাথে পুরোপুরি মেলে না। নৃবিজ্ঞানীরা মোটামুটি এ ব্যাপারে একমত যে, এই তালিকা থেকে কেবলমাত্র একটি সম্পর্কে যৌনমিলন ঘটে থাকলে তা বিশ্বব্যাপী অজাচার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং তা হ'ল, মাতা-পুত্র। এ বাদে, সাধারণভাবে ধরে নেয়া অজাচার নিয়মের লঙ্ঘন, অতীতের কিছু-কিছু সমাজের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। যেমন কিনা প্রাচীন মিশরে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ভাই এবং বোনের বিয়ের প্রচলন ছিল। প্রাপ্ত তথ্য হতে অনুমান করা হয়, যেহেতু কন্যা এবং পুত্র উভয়েই উত্তরাধিকার নিয়মানুসারে সম্পত্তি পেত, এই বিবাহ প্রথার মাধ্যমে পারিবারিক সম্পত্তির অখন্ডতা রক্ষা করা হ'ত। প্রাচীন মিশরের মতনই ভাই-বোন বিয়ের প্রচলন আরো কিছু সমাজে ছিল: **ইনকা** সাম্রাজ্যের সময়কালের পেরু, হাওয়াই, আফ্রিকার **আজান্দে** জনগোষ্ঠী এবং মাদাগাস্কার এবং মায়ানমার (পূর্বে বার্মা নামে পরিচিত)। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সকল ক্ষেত্রেই বিয়েগুলো ছিল অস্থায়ী এবং আনুষ্ঠানিক প্রকৃতির, অথবা উচ্চ সামাজিক শ্রেণী কিংবা অভিজাত শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ ছিল। উপরন্তু লক্ষণীয় যে, নিকট জ্ঞাতির মধ্যে শ্রেণীকরণের মাধ্যমে কিছু-কিছু শ্রেণীর জ্ঞাতি, বিবাহ-সঙ্গী হিসেবে নিষিদ্ধ ছিল। আবার কিছু কিছু জ্ঞাতি অনুমোদিত ছিল: যেমন, সৎ বোনকে বিয়ে করা সম্ভব ছিল কিন্তু একই মায়ের পেটের বোনকে নয়, আবার শুধুমাত্র বড় বোন বিবাহ সঙ্গী হতে পারত, ছোট বোন কিছুতেই নয়। সাধারণভাবে গৃহীত অজাচারের সংজ্ঞায় নৈকট্যের ওপর জোর দেয়া হয়েছে: নিকট আত্মীয়ের মধ্যে যৌন মিলন ঘটলে তা অজাচার। এই ধারণাটিও বাস্তবতার সাথে মেলে না। এমনও সমাজ রয়েছে যেখানে বৃহৎ আত্মীয়কুলের মধ্যে যৌন মিলন নিষিদ্ধ। যদি ঘটে, তা অজাচার হিসেবে বিবেচিত।

অজাচার সম্বন্ধে প্রথাগত নৃবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

তবে এটা উল্লেখ করা জরুরী যে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হলে তা জেনেটিকেলি ক্ষতিকর, সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনো

অজাচার নিষেধাজ্ঞার ব্যাখ্যা হিসেবে সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয়, মানুষ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে করে না যেহেতু এতে পরবর্তী প্রজন্মের উপর নেতিবাচক জেনেটিক প্রভাব পড়তে পারে। এবং এ কারণে অজাচার নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা হয়। কিছু নৃবিজ্ঞানীও এ ধরনের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু এটি বহু নৃবিজ্ঞানীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাঁদের প্রশ্ন হচ্ছে: এই প্রথা অনুসরণ করলে যে দীর্ঘমেয়াদে মনুষ্য প্রজাতি জেনেটিকেলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে (বংশগত অসুস্থতা এবং সেকারণে অধিক হারে মৃত্যুবরণ) – এই তথ্য বিভিন্ন সমাজের মানুষজন কিভাবে জানলেন? যে সকল নৃবিজ্ঞানী বলে থাকেন জেনেটিক কারণে অজাচারের নিষেধাজ্ঞা পালন করা হয়ে থাকে – তাঁরা এই যৌক্তিক আপত্তির কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। শুধু তাই নয়, যাঁরা এই অবস্থানের সমালোচনা করে থাকেন, তাঁরা আরো কিছু জিজ্ঞাসা তোলেন, যেমন, যদি সকল সমাজের সকল মানুষ এটা জেনেই থাকে যে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে করলে পরবর্তী প্রজন্মের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হতে পারে তাহলে কেন কিছু সমাজে কাজিন বিবাহ প্রচলিত? কাজিন বিবাহ দুই ধরনের: “আড়া-আড়ি” এবং “সমান্তরাল”। “আড়া-আড়ি কাজিন” বিয়ে বলতে বোঝায় ফুপাতো-মামাতো ভাই বোনের বিয়ে। চাচাতো এবং খালাতো ভাই বোন “সমান্তরাল কাজিন”, এবং এদের মধ্যে বিয়ে বহু সমাজেই নিষিদ্ধ। কিন্তু কথা হচ্ছে, আড়া-আড়ি হোক কি সমান্তরাল, জৈবিক দিক থেকে দুই ধরনের কাজিনই সমানভাবে নিকট আত্মীয়। তবে এটা উল্লেখ করা জরুরী যে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হলে তা জেনেটিকেলি ক্ষতিকর, সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নন। বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির চূড়ান্ত অভাব সত্ত্বেও মরগান এবং মেইনের তত্ত্বের সাহায্যে জেনেটিক ব্যাখ্যা উনিশ শতকে জনপ্রিয়তা লাভ করে। উনবিংশ শতকের অপর কিছু তাত্ত্বিকগণের মতে – যেমন স্পেনসার এবং লুববক – অজাচার নিষেধাজ্ঞার উৎস হচ্ছে প্রাচীনকালে জঙ্গী উপজাতিদের জোরপূর্বক কনে-আনার প্রথা। ডুর্খাইমের মতে অজাচার নিষেধাজ্ঞা আরো ব্যাপকতর নিষেধাজ্ঞার সাথে যুক্ত: ঋতুস্রাবের রক্ত। একই গোত্রের সদস্যের জন্য গোত্রের সদস্যের রক্তের সংস্পর্শে আসা নিষিদ্ধ। ডুর্খাইমের মতে অজাচার নিষেধাজ্ঞার উৎসের মূলে আছে এই বিশেষ নিষেধাজ্ঞা।

মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের সাহায্যেও অজাচার নিষেধাজ্ঞার ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে । যেমন কিনা হ্যাভেলক এলিস এবং ওয়েস্টারমার্ক-এর তত্ত্ব। এলিস এবং ওয়েস্টারমার্কের মতে, “প্রাকৃতিক বিমুখতা” (natural aversion) হচ্ছে অজাচার নিষেধাজ্ঞার কারণ। ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়ে উঠলে অথবা যাদের সাথে জন্ম থেকে পরিচয়, তাদের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করাটা, এলিস এবং ওয়েস্টারমার্কের মতে, অস্বাভাবিক। এ ধরনের তত্ত্বও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমত, যদি বিমুখতা স্বাভাবিকই হয়ে থাকে তাহলে কেনই বা নিষেধাজ্ঞা? নিষেধাজ্ঞার তো তাহলে প্রয়োজন পড়ে না। দ্বিতীয়ত, কিছু নৃবিজ্ঞানীর মতে: কিছু সমাজে বহু জ্ঞাতি বিবাহ-সঙ্গী হিসেবে নিষিদ্ধ যাদের সাথে ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেনি। এটি স্বাভাবিক বিমুখতা তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। আবার, এও ব্যাখ্যা করা যায় না কেন কিছু সমাজে এমন ধরনের জ্ঞাতিতে বিবাহ অনুমোদিত যাদের সাথে ছোটবেলা থেকে পরিচয় (যেমন কিনা আড়া-আড়ি কাজিন বিয়ে)।

একই ধরনের আপত্তি তোলা হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে বিমুখতা নয়, “আকর্ষণ”-ই স্বাভাবিক। তাঁর তত্ত্ব মতে অজাচার নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন দেখা দেয় যেহেতু মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকে পড়ে অজাচারের প্রতি। অজাচার জন্ম দিতে পারে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের; একারণেই অজাচার সকল সমাজে নিষিদ্ধ। ফ্রয়েড এ প্রসঙ্গে টেনে এনেছিলেন পিতৃ-হত্যা প্রসঙ্গ: তাঁর মতে, মাতাকে যৌনভাবে পেতে চাওয়ার উদ্দেশ্যেই আদিযুগে পিতাকে হত্যা করা হয়। পিতাকে হত্যা করার অপরাধ বোধ থেকেই অজাচার প্রথার জন্ম।

বিংশ শতকের নৃবিজ্ঞানে অজাচারের কারণসমূহ খোঁজার প্রচেষ্টা ভিন্ন মোড় নিয়েছিল। গবেষকগণ সমাজতত্ত্বীয় (sociological) ব্যাখ্যা খোঁজেন। অবশ্য, তার মানে এই নয় যে তাঁরা জৈবিক, মনোবৈজ্ঞানিক অথবা বিবর্তনবাদী যুক্তি উপেক্ষা করেন। নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কি এবং অন্যান্যদের মতে, অজাচার নিষেধাজ্ঞা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই বিধি-নিষেধগুলো পালন না করা হলে একক পারিবারিক সম্পর্ক – বিশেষ করে কর্তৃত্বের সম্পর্ক – চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। অথবা, যদি এ ধরনের

যৌনমিলনের ফলে সন্তান জন্মায় তাহলে জ্ঞাতি পদাবলী ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সমালোচকরা এই তত্ত্বের ত্রুটি দেখিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। তাঁদের কথা হল, কর্তৃত্ব-সম্পর্কের ভাংচুর অথবা জ্ঞাতি পদাবলীর ওলট-পালট – এ সব তো পরের ব্যাপার। ম্যালিনোস্কি মূলত যা বলতে চেয়েছেন তা হ'ল, একক পরিবার গড়ে উঠেছে অজাচার নিষেধাজ্ঞা থেকে। এবং সেক্ষেত্রে, মৌলিক এবং কেন্দ্রীয় প্রশ্ন থেকেই যায়, কেনই বা অজাচার নিষিদ্ধ?

অজাচার সম্বন্ধে লেভি-স্ট্রসের ব্যাখ্যা

লেভি-স্ট্রস তাঁর *দি এলিমেন্টারি স্ট্রাকচারস অফ কিনশিপ* (১৯৬৯) গ্রন্থে, টায়লরের মূলনীতি ধরে এগোন। টায়লর বলেছিলেন, আদিম সমাজে অজাচার নিষেধাজ্ঞা বিবাহ-প্রথার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। টায়লরের নীতি হল: "হয় বহির্গোত্রে বিয়ে কর অন্যথায় বহির্গোত্র দ্বারা খুন হও"। লেভি-স্ট্রস যদিও বিবাহ নিষেধাজ্ঞা এবং অজাচার-নিষেধাজ্ঞা, এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ টানছেন, তিনি টায়লরের মতই এ ধারণার প্রবক্তা যে, একটি অপরটির সাথে যুক্ত। তার মতে, অজাচার নিষেধাজ্ঞা একই সাথে প্রাকৃতিক (natural) এবং সাংস্কৃতিক (cultural)। প্রাকৃতিক, কারণ এই নিষেধাজ্ঞা বিশ্বজনীন। আবার সাংস্কৃতিক, কারণ এটা শুধুমাত্র নিয়ম না, এই নিয়ম এক সমাজ হতে আরেক সমাজে ভিন্ন। লেভি-স্ট্রসের মতে, এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে লুকিয়ে আছে মনুষ্য সমাজ ও সংস্কৃতির চাবিকাঠি। চাবিকাঠি এই অর্থে যে, পরিবারের ভিতরে বিয়ে করা যদি অজাচার (নিষিদ্ধ) হয়, তার অর্থ পরিবারের বাইরে বিয়ে করা বাঞ্ছনীয়। একটি দলের অপর দলের সাথে নারী বিনিময় (exchange of women) সৃষ্টি করে মনুষ্য সমাজের মধ্যেকার আদান-প্রদানের ব্যবস্থা (system of reciprocity)। এই আদান-প্রদানের ব্যবস্থার সাহায্যে সমাজ ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে যার মূলে রয়েছে যোগাযোগ এবং বিনিময়। লেভি-স্ট্রসের ভাষায়, "the incest prohibition expresses the transition from the natural fact of consanguinity to the cultural fact of alliance" (বিবাহ করা একটি প্রাকৃতিক সত্য। বিবাহের মাধ্যমে মৈত্রী স্থাপন করা একটি সাংস্কৃতিক সত্য। অজাচার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে প্রকাশ পায় এক ধাপ হতে আরেক ধাপে উত্তরণ)। লেভি-স্ট্রস অজাচার সমস্যার আলোচনার সূত্র ধরেই মনুষ্য সমাজ কি কি ধরনের মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করে, এই আলোচনায় চলে যান। এ সম্পর্কে আপনারা ২ নং ইউনিটের ৫ নং পাঠে জেনে এসেছেন। কিন্তু লেভি-স্ট্রসের তত্ত্বও একই সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে: যৌন সম্পর্ক এবং বিবাহ সম্পর্ক, এ দুটো এক জিনিস নয়, এবং যেহেতু এ দুটো একই জিনিস নয় সে কারণে একটার সাহায্যে আরেকটার ব্যাখ্যা করা সম্ভব না।

অজাচার নিষেধাজ্ঞা একই সাথে প্রাকৃতিক (natural) এবং সাংস্কৃতিক (cultural)। প্রাকৃতিক, কারণ এই নিষেধাজ্ঞা বিশ্বজনীন। আবার সাংস্কৃতিক, কারণ এটা শুধুমাত্র নিয়ম না, এই নিয়ম এক সমাজ হতে আরেক সমাজে ভিন্ন।

এর আগের পাঠ (৪ নং ইউনিটের ১ নম্বর পাঠ), যেটা বিয়ে সংক্রান্ত, তাতে উল্লেখ্য করা হয়েছে, সাম্প্রতিককালের নৃবিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা কাজে এবং লেখালেখিতে বিয়ের কোন সর্বজনীন সংজ্ঞা খোঁজার পরিবর্তে ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতার ওপর জোর দিচ্ছেন। ঠিক একইভাবে, অজাচার বিষয়ে যাঁরা বর্তমানে কাজ করছেন, তাঁরাও অজাচারের বিশ্বজনীন উৎসের সন্ধান না করে, নির্দিষ্ট সমাজে, নির্দিষ্ট সময়কালে অজাচার বলতে কি বোঝায়, কিভাবে ঘটে থাকে, এসব বিষয়াদি নিয়ে কাজ করছেন।

সারাংশ

অজাচার কি, এবং অজাচার নিষেধাজ্ঞা, বিবাহ-সঙ্গী বাছাইয়ের নিষেধাজ্ঞা, মানানসই মিলনের ধারণা – এগুলোর ভিন্নতা এই পাঠে আলোচিত হয়েছে। অজাচারের ধারণা অতীত এবং বর্তমানের সকল সমাজে থাকলেও, কোন্ কোন্ সম্পর্কে যৌন-মিলন নিষিদ্ধ, তার ধারণা ও অনুশীলন সকল সমাজে একরকম নয়। এ কারণে অজাচারের কোন বিশ্বব্যাপী সংজ্ঞা এ পর্যন্ত দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। অনেকের মতে, ভবিষ্যতেও হবে না। অজাচার কেন নিষিদ্ধ এ বিষয়ে কেবলমাত্র নৃবিজ্ঞানীরা নন, অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের চিন্তকেরাও মনোনিবেশ করেছেন, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এই ব্যাখ্যাগুলো গুরুত্ব দিয়েছে অজাচার-নিষেধাজ্ঞার উৎসের উপর। ব্যাখ্যাদানকারীরা এপর্যন্ত অতীত এবং বর্তমান সকল সমাজের ক্ষেত্রে কার্যকরী একটিমাত্র উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এই ব্যর্থতা থেকে বর্তমানের নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা জন্মেছে যে, নির্দিষ্টতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে অজাচারের কারণ খোঁজা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের সাহায্যে অজাচার নিষেধাজ্ঞা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন কোন দুজন তাত্ত্বিক?
ক. মীড এবং ডগলাস খ. স্পেনসার এবং লুববক
গ. হ্যাভেলক এলিস এবং ওয়েস্টারমার্ক ঘ. উপরের কেউই নন

২। লেডি-স্ট্রক এর মতে অজাচার বিষেধাজ্ঞা একই সাথে ---------------------------- ।
ক. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক খ. প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক
গ. প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৩। "একক পরিবার গড়ে উঠেছে আজাচার নিষেধাজ্ঞা থেকে" - উক্তিটি কার?
ক. ব্রনিম্ল ম্যালিনোস্কি খ. লুইস হেনরী মর্গান
গ. ক্লদ লেডি-স্ট্রস ঘ. ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অজাচার কী?

২। অজাচার নিষেধাজ্ঞা, বিবাহ-সঙ্গী বাছাইয়ের নিষেধাজ্ঞা এবং মানানসই মিলন – এগুলো বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অজাচারের বিশ্বব্যাপী সংজ্ঞা দাঁড় করানো অসম্ভব। কেন, তা আলোচনা করুন।

২। অজাচার সংক্রান্ত লেভি-স্ট্রসের চিন্তা-ভাবনায় "প্রকৃতি" এবং "সংস্কৃতি"-র ধারণার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

বিয়ের ধরন
Types of Marriage

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- বিবাহের শ্রেণীকরণের মূলনীতি
- পাশ্চাত্য সমাজে বিয়ে হচ্ছে দাম্পত্য-ভিত্তিক
- পাশ্চাত্য সমাজের প্রতিষ্ঠানাদি ও সংস্কৃতির প্রসার অপাশ্চাত্য সমাজের বিয়েকে পুনর্গঠিত করেছে

> *চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে নৃবিজ্ঞানীরা বিয়ে ব্যবস্থার শ্রেণীকরণ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে: বিবাহ সঙ্গী নির্ধারণের ক্ষেত্রে গোত্রের গুরুত্ব, পতি-পত্নী সংখ্যা, পতি কিংবা পত্নীর ভাই/বোন বিবাহ সঙ্গী হতে পারে কি না, এবং বিবাহে মূল্যবান সামগ্রীর আদান-প্রদান।*

চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে নৃবিজ্ঞানীরা বিয়ে ব্যবস্থার শ্রেণীকরণ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে: বিবাহ সঙ্গী নির্ধারণের ক্ষেত্রে গোত্রের গুরুত্ব, পতি-পত্নী সংখ্যা, পতি কিংবা পত্নীর ভাই/বোন বিবাহ সঙ্গী হতে পারে কি না, এবং বিবাহে মূল্যবান সামগ্রীর আদান-প্রদান।

অন্তঃর্গোত্র ও বহিঃর্গোত্র বিবাহ : বিবাহ-সঙ্গী নির্ধারণের ক্ষেত্রে গোত্র সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই গুরুত্বকে স্পষ্ট করে তোলেন বৃটিশ আইনজীবী ম্যাকলেনান। তিনি প্রথমে অন্তর্গোত্র (endogamy) এবং বহির্গোত্র (exogamy) পদ দুটির প্রবর্তন করেন। স্পষ্টতই, প্রথমটি ইঙ্গিত করে গোত্রের ভেতরে বিয়ে আর দ্বিতীয়টি ইঙ্গিত করে গোত্রের বাইরে বিয়ে। প্রশ্ন জাগতে পারে: গোত্র বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? এই গোত্র কি সকল সমাজে এক? এখানে, গোত্র বলতে নৃবিজ্ঞানীরা বোঝাচ্ছেন একটি জ্ঞাতিভিত্তিক সামাজিক দল। এর সদস্যপদ, নির্দিষ্ট সমাজের জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা অনুসারে, এক সমাজ হতে আরেক সমাজে ভিন্ন হতে পারে। নৃবিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, বিবাহ ব্যবস্থা কেবলমাত্র দুই ধরনের হতে পারে: অন্তর্গোত্রীয় কিংবা বহির্গোত্রীয়। এ ধারণা যে ভ্রান্ত তার প্রতি নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান ফরাসী নৃবিজ্ঞানী লেভি-স্ট্রস। তিনি বলেন, সকল বিবাহ ব্যবস্থা একই সাথে অন্তর্গোত্রীয় এবং বহির্গোত্রীয়। এ কথা বলার পিছনে লেভি-স্ট্রসের যুক্তি ছিল: যে কোন বিয়ে ব্যবস্থা একটি দলের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ করে, এবং আরেকটি দলের মধ্যে বিয়ে অনুমোদন করে (এ বিষয়টি ২ নং ইউনিটের ৫ নং পাঠে আলোচিত হয়েছে)।

> *অন্তর্গোত্রীয় বিয়ের সবচাইতে প্রচলিত ধরন হচ্ছে কাজিন-বিবাহ। ভারতবর্ষে অন্তর্গোত্রীয় বিয়ের ভাল উদাহরণ হচ্ছে জাতিভিত্তিক (caste) বিবাহ।*

অন্তর্গোত্রীয় বিয়ের সবচাইতে প্রচলিত ধরন হচ্ছে কাজিন-বিবাহ। কাজিন বিবাহের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু সমাজে আছে আড়াআড়ি কাজিন বিবাহ নীতি। এখানে বিয়ে সংগঠিত হয় আড়াআড়ি কাজিনদের মাঝে: ফুপাত-মামাত ভাই ও বোন। আবার কিছু-কিছু সমাজে সমান্তরাল কাজিনদের মধ্যে বিয়ে বাঞ্ছনীয়: চাচাত-খালাত ভাই ও বোন। সমান্তরাল কাজিন বিয়ের প্রচলন দেখা যায় উত্তর আফ্রিকার মুসলমান আরবদের মধ্যে। বর্হিগোত্রীয় বিবাহ প্রথা অনুসারে গোত্র বা দলের বাইরে বিবাহ বাঞ্ছনীয়। ট্রব্রিয়াণ্ড সমাজের বাসিন্দারা বিয়ে করেন নিজ গোষ্ঠী ও গোত্রের বাইরে। লেভি-স্ট্রস অনুসরনে কিছু নৃবিজ্ঞানী বিয়েকে দেখেন মৈত্রী স্থাপনের একটি উপায় হিসেবে। তাঁরা বলেন, বিয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, সম্ভব হতে পারে এমন দ্রব্য ও সম্পদের বিনিময় যা সে এলাকায় পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষে অন্তর্গোত্রীয় বিয়ের ভাল উদাহরণ হচ্ছে জাতিভিত্তিক (caste) বিবাহ। অন্য কথায়, জাতির (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ) ভেতরে বিবাহ-সঙ্গী বাছাই বাঞ্ছনীয়। তবে, মনে রাখা জরুরী যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার এবং পুঁজিবাদ জাতিভিত্তিক বিবাহ ব্যবস্থায় বদল ঘটিয়েছে, ঘটাচ্ছে। নৃবিজ্ঞানীরা একমত যে বহির্গোত্রীয় এবং অন্তর্গোত্রীয়, এই দুই নীতির সাথে অন্যান্য বিষয় যুক্ত – যেমন কিনা স্থানিক দল, জ্ঞাতি দল, শ্রেণী, জাতিবর্ণ এবং হয়তো অপরাপর সামাজিক বিভাজন। আধুনিকায়নপন্থী নৃবিজ্ঞানীরা বহির্গোত্রীয় এবং অন্তর্গোত্রীয় বিয়েকে দেখেন "ঐতিহ্যবাহী", পিছিয়ে পড়া, জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের রীতিনীতি হিসেবে। তাঁরা বলেন, আধুনিক, শিল্পভিত্তিক সমাজে জ্ঞাতিত্বের মতন আদিম সম্পর্কের স্থান নেই, এ ধরনের সমাজে সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি হচ্ছে যৌক্তিকতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতা, অনুভূতি বা

বংশ-পরম্পরায় আঁকড়ে-ধরা বিশ্বাস নয়। আধুনিকায়নের সাথে সাথে, শিল্পায়নের সাথে সাথে এ ধরনের সম্পর্কের উচ্ছেদ ঘটতে বাধ্য।

সাম্প্রতিক কালে, নৃবিজ্ঞানে (এবং অন্যান্য জ্ঞানকান্ডে) এ ধরনের পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক ও মতাদর্শিক ধ্যান-ধারণা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, হচ্ছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমানের আধুনিক ইউরোপে অন্তর্গোত্রীয় বিবাহের প্রচলন ইউরোপের রাজবংশের মধ্যে বিদ্যমান। কঠোরভাবে পালিত না হলেও বলা চলে, নিজ গোত্রের মধ্য থেকে বিবাহ-সঙ্গী বাছাই করা কাম্য হিসেবে বিবেচিত এবং এটি বাস্তবে অনুশীলিত। নিজ গোত্রের মধ্যে বিয়ে করা যে কাম্য, এটি লিখিত রূপে কোথাও নেই বা বারবার জনসমক্ষে উচ্চারিতও হয় না। কিন্তু ইউরোপভিত্তিক রাজবংশগুলোর সামাজিক সংগঠনের এটি একটি মূলনীতি। এক্ষেত্রে "গোত্র" বা "দল" হচ্ছে সর্ব-ইউরোপব্যাপী রাজবংশ (এটি অবশ্য অখন্ড কিছু নয়, এর কোন একটি মাত্র উৎস নেই) এবং অধিকাংশ বিয়ে রাজবংশের কোন না কোন শাখা-উপশাখার মধ্যেই ঘটে থাকে। আরো উদাহরণ দেয়া সম্ভব। নরবর্ণকে যদি আমরা একটি সামাজিক দল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি (আলবত, যেই দলের সংজ্ঞা করা হয়ে থাকে জৈবিকতার ভিত্তিতে) তাহলে ইউরোপ ও উত্তর-আমেরিকার অধিকাংশ বিয়েকে অন্তর্গোত্রীয় মনে হতে পারে, যেহেতু শ্বেতাঙ্গরা পরস্পরকে বিয়ে করে। যদিও ইউরোপ ও আমেরিকায় মিশ্র-বর্ণ বিয়ে ঘটে কিন্তু শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ের প্রধান ধারা হচ্ছে বর্ণভিত্তিক, অর্থাৎ অন্তর্গোত্রীয়।

নরবর্ণকে যদি আমরা একটি সামাজিক দল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি ... তাহলে ইউরোপ ও উত্তর-আমেরিকার অধিকাংশ বিয়েকে অন্তর্গোত্রীয় মনে হতে পারে, যেহেতু শ্বেতাঙ্গরা পরস্পরকে বিয়ে করে।

পতি-পত্নী সংখ্যা: এই মূলনীতির ভিত্তিতে বিয়েকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: (ক) বহু-পত্নী (polyandrous) বিবাহ, (খ) বহু-পতি (polygynous) বিবাহ, এবং (গ) এক-পতিপত্নী (monogamous) বিবাহ। বহু-পত্নী বিবাহ বহু বিবাহের (polygamous, polygamy) একটি ধরন। বিয়ের এই ব্যবস্থায় স্বামীর থাকে একাধিক স্ত্রী। কোন কোন সমাজে, স্ত্রীরা জ্ঞাতি সম্পর্কে হন পরস্পরের ভগ্নী। নৃবিজ্ঞানীরা এ ধরনের বিয়ের নামকরণ করেছেন *ভগ্নী বহু-পত্নী বিবাহ* (sororal polygyny)। বহু-পতি বিয়ের তুলনায়, বহু-পত্নী বিয়ে বেশি প্রচলিত এবং নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এর প্রচলন আঞ্চলিক নয়। বিশ্বের বহু অঞ্চলে বিয়ের এই ধরনকে স্বাভাবিক ভাবা হয়। এই ভাবনার ব্যতিক্রম হচ্ছে খ্রিস্টীয়-প্রধান ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা। খ্রীস্টিয় ধর্ম মতে বিয়ে হতেই হবে এক-পতিপত্নী বিবাহ। বহু পতি-পত্নী বিবাহ খ্রিস্টীয়-প্রধান ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় আইনগতভাবে নিষিদ্ধ।

যে সকল অঞ্চলে বংশধারা ব্যবস্থা বিদ্যমান সেখানে দেখা গেছে যে, সকল পুরুষ নয় বরং শুধুমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ক্ষমতাশালী পুরুষেরা বহু-পত্নী বিবাহ করে থাকেন। কিছু কিছু সমাজে, এটি শুধু মাত্র দলনেতা অথবা মাতব্বর বা সর্দারদের জন্য রক্ষিত। **আমাজন** অঞ্চলের সমাজে, একাধিক স্ত্রী থাকা ক্ষমতার চিহ্ন, আবার ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করবার পথ। একাধিক স্ত্রীর মাধ্যমে জ্ঞাতিকুল বৃদ্ধি করা সম্ভব, বহু সন্তান-সন্ততি লাভ করা সম্ভব। বিবাহসূত্রে অর্জিত এই বিশাল জ্ঞাতিকুল একজন দলনেতার দলকে ভারী করে, নানান ধরনের কৌশলী মিত্রসম্পর্ক স্থাপনে এটি তাঁর কাজে লাগে। এই বিবাহ প্রথা পুরুষটির অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয় কারণ আংশিকভাবে হলেও, তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের শ্রম নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, বহু-পত্নী বিবাহ অনেক ক্ষেত্রেই বয়সের অসমতার সাথে যুক্ত। বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষেরা বিয়ে করেন অল্প-বয়স্ক নারীদের; এবং এ সমাজগুলোতে দেখা যায়, অল্পবয়স্ক পুরুষেরা হয় বহু বছর অবিবাহিত থাকেন অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের বিধবাদের বিয়ে করেন। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, বহু-পত্নী বিবাহের প্রচলন ঘটে এমন ধরনের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হচ্ছে মানুষ। যে সকল সমাজে জমি এবং অন্যান্য ধরনের ব্যক্তিসম্পত্তি বিদ্যমান, সেখানে এক-পতিপত্নী বিবাহের প্রচলন দেখা যায়।

***আমাজন** অঞ্চলের সমাজে, একাধিক স্ত্রী থাকা ক্ষমতার চিহ্ন, আবার ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করবার পথ। একাধিক স্ত্রীর মাধ্যমে জ্ঞাতিকুল বৃদ্ধি করা সম্ভব, বহু সন্তান-সন্ততি লাভ করা সম্ভব।*

বহু -পতি ব্যবস্থায় একজন স্ত্রীর থাকে একাধিক স্বামী। তিব্বত, নেপাল এবং ভারতের কিছু অঞ্চলে এধরনের বিয়ের প্রচলন দেখা গেছে। দক্ষিণ ভারতের **টোডা**দের মাঝে দেখা গেছে যে, একজন নারীর যে পুরুষের সাথে বিয়ে হয়, তাঁর অপর ভাইয়েরা সকলেই তাঁর স্বামী। যদি বিয়ের পর স্বামীর ভাই জন্মায়, তাহলে সেও স্বীকৃত হয় তার ভাইয়ের বউয়ের স্বামী হিসেবে। স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ত্বা হন, তাঁর সন্তানের জৈবিক পিতা কে, সেটা নির্ধারণ করা জরুরী মনে করা হয় না। বাচ্চা যখন সাত মাস পেটে, তখন "ধনুক দেয়ার" ("giving the bow") অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য হচ্ছে, সমাজ ও আইনের দৃষ্টিতে সন্তানের বাবা কে, তা ঠিক করা। ঘাস-ডালপালা দিয়ে একটি প্রতীকী তীর-ধনুক বানিয়ে, সাধারণত যে ভাই সকল স্বামীর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি হবু সন্তানের মাকে এটি উপহার দেন। স্বামীর জ্ঞাতগোষ্ঠী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। তীর-ধনুকের এই সম্প্রদান অনুষ্ঠান

উপস্থিত সকলকে জানিয়ে দেয় যে তিনি হচ্ছেন হবু সন্তানের পিতা। একাধিক সন্তান হবার পর, দ্বিতীয় ভাই “ধনুক” উপহার দেন তাঁর/তাঁদের স্ত্রীকে।

নৃবিজ্ঞানী বেররিম্যান-এর অভিমত হচ্ছে, হিমালয় অঞ্চলের বহু-পতি প্রথার মূল কারণ হচ্ছে ভূমির স্বল্পতা। বহু-পতির ফলে পরিবারের সাইজ ছোট থাকে।

কিছু নৃবিজ্ঞানীদের মনে হয়েছে, বহু-পতি ব্যবস্থা শিশুকন্যা হত্যার সাথে সম্পর্কিত কারণ যেসব অঞ্চলে এ ধরনের বিয়ের প্রচলন, সেখানে জন্মের পরপরই শিশুকন্যাকে হত্যা করার রীতি আছে। কিন্তু যেহেতু শিশুকন্যা হত্যা বহু-পত্নী বিবাহ অঞ্চলেও প্রচলিত, সে কারণে এই সিদ্ধান্ত অনেক নৃবিজ্ঞানীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। নৃবিজ্ঞানী বেররিম্যান-এর অভিমত হচ্ছে, হিমালয় অঞ্চলের বহু-পতি প্রথার মূল কারণ হচ্ছে ভূমির স্বল্পতা। বহু-পতির ফলে পরিবারের সাইজ ছোট থাকে। এবং, এতে জমি খন্ড-বিখণ্ডিত হয় না। এখানে লক্ষণীয় যে, বহু-পত্নী ব্যবস্থায় একজন স্বামী বহু সন্তান লাভ করতে পারেন কিন্তু বহু-পতি ব্যবস্থায়, এমনটি ঘটে না। তার কারণ, স্বামীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে নারীর সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না, সেটি অপরিবর্তিত থেকে যায়। বেররিম্যানের মতে, বহু-পতি প্রথা ভূমিজ সম্পদ এবং শ্রম সম্পদের সামঞ্জস্য সাধন করে তোলে। তিনি আবার একইসাথে আমাদের সতর্ক করে দেন যে, সামঞ্জস্য সাধনের একটি মাত্র সম্ভাব্য কৌশল হচ্ছে বহু-পতি বিবাহ। তার কারণ, হিমালয় অঞ্চলের এই হিন্দু সমাজগুলোতে, একই সাথে এক-পতিপত্নী বিবাহেরও প্রচলন আছে।

এক-পতিপত্নী বিবাহ প্রথা অনুসারে একজন নারীর সাথে একজন পুরুষের বিবাহ ঘটে। দেখা গেছে, কিছু অঞ্চলে এক-পতিপত্নী বিয়ের অর্থ হচ্ছে বিবাহিত থাকা অবস্থায় অন্য কোন পতি বা পত্নী গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু, যদি স্বামী কিংবা স্ত্রীর মৃত্যুর মাধ্যমে, অথবা ছাড়াছাড়ির মাধ্যমে, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে তাহলে স্ত্রী কিংবা স্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারেন। কিছু অঞ্চলে, এমনটি নয়। অর্থাৎ, ছাড়াছাড়ি অনুমোদিত নয়; উপরন্তু স্বামী কিংবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর, পুনরায় বিয়ে করা অনুমোদিত নয়। পুনরায় বিয়ের প্রচলনের নামকরণ নৃবিজ্ঞানীরা করেছেন *ক্রমান্বিক এক-পতিপত্নী বিবাহ* (serial monogamy)।

স্বামীর ভাই ও শ্যালিকা বিবাহঃ স্বামীর ভাই (levirate) ব্যবস্থা হচ্ছে সেটি, যেখানে স্বামী মারা যাবার পর, বিধবা স্ত্রীকে স্বামীর ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। আমাদের অঞ্চলে, স্বামী মারা গেলে দেবরের সাথে বিয়ে দেয়ার প্রচলন আছে। কিন্তু এমন কিছু সমাজ আছে যেখানে বিয়ে দেবর কিংবা ভাসুর, যে কারো সাথে অনুষ্ঠিত হতে পারে। নুয়ের সমাজে মৃত স্বামীর আপন ভাই বিয়ে করতে পারেন বিধবাকে; যদি মৃত স্বামীর ঔরসজাত কোন সন্তান না থেকে থাকে তাহলে, পরবর্তী বিয়ের সন্তানেরা মৃত স্বামীর সন্তান হিসেবে বিবেচিত হন। কিছু নৃবিজ্ঞানী এই নিয়মের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ এই নিয়ম পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামান্তর যেখানে বিয়ের পর, বউ শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি হয়ে যায় অথবা তারা গোত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ব্যাখ্যা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এমনও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আছে যেখানে বিয়ের এই নীতি অনুপস্থিত। আবার, এমন সমাজেও এই নীতি বিদ্যমান, যে সমাজকে কোনভাবেই পিতৃতান্ত্রিক বলা যায় না। শ্যালিকা বিবাহ (sororate) নীতি অনুসারে, স্ত্রী মারা গেলে তার স্বামী নিজ শ্যালিকাকে বিয়ে করেন অথবা বিয়ে করার অধিকার রাখেন। স্ত্রী বেঁচে থাকলেও শ্যালিকা বিবাহ ঘটতে পারে। কিছু সমাজে স্ত্রী যদি নিঃসন্তান হন, তাহলে স্বামী তার শ্যালিকাকে বিয়ে করার অধিকার রাখেন। শ্যালিকার গর্ভে জন্মলাভ করা কিছু সন্তান প্রথম স্ত্রীর আপন সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয়। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, স্বামীর ভাই ও শ্যালিকা বিবাহ প্রমাণ করে যে, অপাশ্চাত্য সমাজে বিয়ে সংগঠিত হয়, দুটি দল বা জ্ঞাতিকুল বা গোষ্ঠীর মধ্যে; দুজন ব্যক্তির মধ্যে নয় – যা কিনা পাশ্চাত্য সমাজের নিয়ম, এবং আদর্শ – দুটোই।

বিয়েতে আদান-প্রদানঃ বিয়ে উপলক্ষ্যে বর পক্ষ যদি কনে পক্ষকে মূল্যবান সামগ্রী দেয় সেটিকে বলা হয় কনে পণ (bridewealth, bride price)। সামগ্রীর আদান-প্রদান যদি হয় উল্টোভাবে, অর্থাৎ, বিয়ে উপলক্ষ্যে কনে পক্ষ যদি বর পক্ষ, অথবা বরকে, মূল্যবান সামগ্রী প্রদান করে, সেটিকে বলা হয় যৌতুক (dowry)। যে সমাজগুলোতে প্রথা অনুসারে কনে পণ দেয়া হয়, সেখানে দেখা গেছে যে, প্রয়োজনীয় মূল্যবান সামগ্রী বরের পক্ষে একা, এমনকি শুধুমাত্র তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষে, যোগাড় করা সম্ভব নয়। গোষ্ঠীর কোন পুরুষ সদস্যের জন্য বউ আনতে বিক্ষিপ্ত জ্ঞাতিকুলের কসরত করতে হয়। ঠিক একইভাবে, প্রাপ্ত সামগ্রী বউ পক্ষের বিক্ষিপ্ত জ্ঞাতিকুলের মধ্যে বিতরণ করা হয় যাতে যাঁরা পূর্বে সেই গোষ্ঠীতে বউ আনতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরাও এই সামগ্রীর ভাগীদার হন। প্রতিটি বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনে জটিল ধরনের ঋণগ্রস্ততা ও পারস্পরিক লেনদেনের সূত্রপাত ঘটে, যা বংশ পরম্পরায় চলমান। কনে পণ সংগ্রহ এবং তার পুনর্বণ্টনে বহু মানুষজন জড়িত। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে, কিছু কিছু সমাজে দেখা যায় যে, কনে পণ ফেরৎ দেয়ার ক্ষেত্রে কার কি দায়বদ্ধতা এবং তার হিসেবনিকেশ, দুই প্রজন্মের মানুষজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

নৃবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ বলে, কনেপণ-প্রদত্ত বিয়েতে প্রচুর পরিমানে ব্যয় করা হয়। আচার-প্রথা পালন বিয়ের অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে বাড়িয়ে তোলে। ধরে নেয়া যেতে পারে যে, লোকসম্মুখে আয়োজিত, ধূমধামের বিয়ের লক্ষ্য হচ্ছে, এই নতুন সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদটি সবার কাছে পৌঁছে দেয়া, সেটার সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন, এবং হবু সন্তানদের বৈধতা ঘোষণা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, কনে পণ প্রদান নারীর সেবার অধিকার হস্তান্তরের ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ, এর পর থেকে, তার শ্বশুরকুল তার গৃহীসেবা, যৌনক্ষমতা, এবং বাচ্চা জন্মদানের ক্ষমতার অধিকারী; তার পিতৃকুল নয়। নৃবিজ্ঞানী লিয়েনহার্ট-এর অভিমত হচ্ছে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, কনে পণকে দেখা হয় কন্যা সন্তানকে বড় করে তোলার কষ্ট, খাটা-খাটনির ক্ষতিপূরণ, এবং তার শ্রমশক্তি হারানোর ক্ষতিপূরণ, হিসেবে।

নৃবিজ্ঞানী লিয়েনহার্ট-এর অভিমত হচ্ছে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, কনে পণকে দেখা হয় কন্যা সন্তানকে বড় করে তোলার কষ্ট, খাটা-খাটনির ক্ষতিপূরণ, এবং তার শ্রমশক্তি হারানোর ক্ষতিপূরণ, হিসেবে।

কিছু সমাজে প্রচলন আছে *কনে সেবার* (bride service)। এসকল সমাজে, স্ত্রীতে অধিকার প্রাপ্তির বিনিময়ে বর তার শ্বশুরবাড়িতে নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য শ্রম ও সেবা দেন। এ ব্যবস্থার প্রচলন সে ধরনের সমাজে দেখা যায় যেখানে মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহ করা কঠিন। আফ্রিকার **কুং!**দের মাঝে, জামাই তার শ্বশুরকুলকে শ্রম ও সেবা দিতে পারেন পনের বছর পর্যন্ত, কিংবা তৃতীয় সন্তান জন্মানো পর্যন্ত।

পূর্বে, যৌতুক বিবাহ ইউরোপে প্রচলিত ছিল। ভারতের যৌতুক প্রথার ব্যাখ্যা নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন মত লক্ষণীয়। এক দল মনে করেন যে, যৌতুক দেয়া হয় কন্যাকে। কন্যা যেহেতু বিয়ে সূত্রে ঘর ছেড়ে চলে যান এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নন, সেকারণে পিতা-মাতা কন্যার বিয়ে উপলক্ষ্যে তাকে মূল্যবান সামগ্রী উপহার দেয়। অন্য দল মনে করেন, যৌতুক কন্যাকে নয়, বরং বর এবং তার পরিবারকে দেয়া হয়। তাঁদের ব্যাখ্যা হল : সামাজিকভাবে নারীদের দেখা হয় অর্থনৈতিক বোঝা হিসেবে। বোঝা হিসেবে বিবেচিত হবার কারণ হ'ল, উঁচু জাতের নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন না। নিচু জাতের নারীরা যদিও তা করে থাকেন, উঁচু জাতের প্রথা, রীতি-নীতি অনুসরণের প্রবনতার কারণে এ জাতেও যৌতুকের প্রচলন দেখা দেয়। বর পক্ষের জন্য বিয়ের অর্থ হচ্ছে একজন “বোঝা”-কে খাওয়া-পরার দায়ভার গ্রহণ করা। বোঝা গ্রহণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে যৌতুক প্রদান করা হয়।

চিত্র ১: যৌতুক

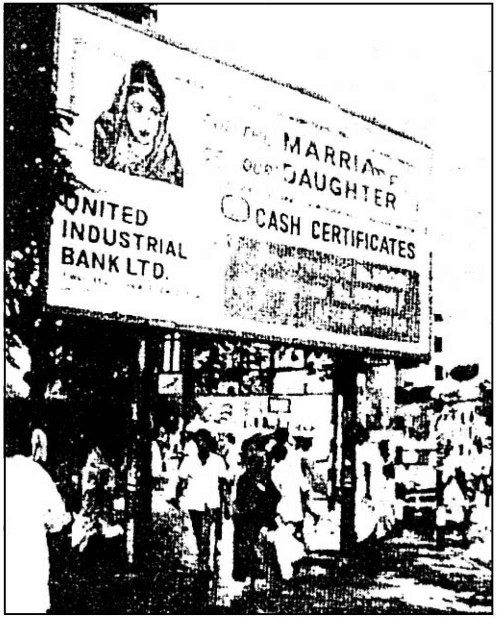

কলকাতা শহরের একটি বিলবোর্ড বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের বিষয় হচ্ছে কন্যা সন্তানের বিয়ের জন্য ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয়ের আহ্বান।

সূত্র: Carol R. Ember/Melvin Ember (1990) *Cultural Anthropology*, Instructor's Edition, 6th edition, New Jersey: Prentice-Hall, পৃ: ১৮১।

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তখন নারী-পুরুষের মধ্যকার পূর্বতন বৈষম্য নতুন আঙ্গিকে গড়ে ওঠে। এতে লিঙ্গীয়ভাবে পুরুষেরাই লাভবান হয়: শিক্ষা এবং আয়করী দক্ষতা অর্জন, চাকরি প্রাপ্তি, সম্পত্তি ক্রয়।

ব্যাখ্যা দুটি ভিন্ন হলেও সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে। একটি তৃতীয় ব্যাখ্যা কিছু নৃবিজ্ঞানী দাঁড় করান। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, দুটো দৃষ্টিভঙ্গিই নারী-পুরুষের মাঝে বিরাজমান বৈষম্যকে গুরুত্বহীন করে তোলে, এই বৈষম্যকে আড়াল করে। আড়াল করার এই কাজটি, এ সকল নৃবিজ্ঞানীদের মতে, বিদ্যমান ব্যবস্থার বৈষম্যের প্রতি সাফাই-গাওয়ার সামিল। তার কারণ, এ দুটো দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলোর ("নারী'র কাজ মূল্যহীন", "কন্যাসন্তান একটি বোঝা", "মেয়ের পিতা-মাতা যা কিছু দেন তা উপহার হিসেবে দেন, খুশি হয়ে দেন") পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাঁদের বিশ্লেষণে, আধুনিক অর্থনীতি হচ্ছে পুঁজিবাদী। পুঁজিবাদী অর্থনীতি মাত্রই বৈষম্যমূলক – শ্রেণী, নরবর্ণ এবং লিঙ্গীয়ভাবে। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তখন নারী-পুরুষের মধ্যকার পূর্বতন বৈষম্য নতুন আঙ্গিকে গড়ে ওঠে। এতে লিঙ্গীয়ভাবে পুরুষেরাই লাভবান হয়: শিক্ষা এবং আয়করী দক্ষতা অর্জন, চাকরি প্রাপ্তি, সম্পত্তি ক্রয়। এ সকল নৃবিজ্ঞানীদের মতে, উনবিংশ শতকের শেষভাগ এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভে, বাংলা অঞ্চলে মজুরি-ভিত্তিক অর্থনীতির সূত্রপাত এবং বিস্তারের কাহিনী হচ্ছে পুরুষ-প্রাধান্য স্থাপনের ইতিহাস। চাকুরি-ভিত্তিক এবং মজুরি-ভিত্তিক এই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুরুষের শ্রম হয়ে ওঠে "মূল্যবান" এবং নারীর শ্রম হয়ে পড়ে "মূল্যহীন"। ফলাফল হিসেবে দেখা দেয় যৌতুকের প্রচলন, এমন সম্প্রদায়েও যাদের মাঝে আগে এর প্রচলন ছিল না। যেমন ধরুন, বাঙ্গালি মুসলমান সমাজ। শুরুর দিকে, কেবলমাত্র মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে এর প্রচলন দেখা দিলেও, পরবর্তী পর্যায়ে এটি সকল শ্রেণীতে ছড়িয়ে পড়ে। যৌতুক পারিবারিক এবং গৃহস্থালী পর্যায়ে পুরুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। নারী-পুরুষের মধ্যকার এই অর্থনৈতিক বৈষম্য শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়: স্ত্রীকে স্বামীর ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়, যৌতুক আনতে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া হয়, স্ত্রীকে এর জন্য মারধর করা হয়, কখনও কখনও এর কারণে স্ত্রী এসিড নিক্ষেপের শিকার হন, ক্ষেত্রবিশেষে তাকে হত্যা করা হয়।

বিবাহ উপলক্ষে কেবলমাত্র সামগ্রী বা মূল্যবান জিনিসপত্রের আদান-প্রদান নয়, দুই কুলের মধ্যে নারীরও আদান-প্রদান হতে পারে। নাইজেরিয়ার **টিভ** সমাজে এভাবে ঘরে বউ আনার প্রচলন আছে। দুই গোষ্ঠী *কন্যার বিনিময়ে কন্যা* প্রদান করেন। এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, নতুন বউ নিজ নিজ শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে, চলে যাওয়া কন্যার নাম গ্রহণ করেন।

পাশ্চাত্য সমাজসমূহে বিয়ে হচ্ছে দাম্পত্য-ভিত্তিক। এসকল সমাজে বিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ এবং প্রেম-ভালবাসা-ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিয়ের অন্য কোন ভিত্তি ("বাবা-মায়ের পছন্দ", "দুই বংশকে আরো কাছে করতে চাই") অনৈতিক হিসেবে বিবেচিত হয়। বিয়ের অর্থ হচ্ছে স্বতন্ত্র গৃহস্থালী স্থাপন এবং দাম্পত্যকেন্দ্রিক জীবন যেখানে স্বামী ও স্ত্রী, একে অপরের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ও সাথী। বিয়েতে একান্তভাবে দম্পতিকে উপহার দেয়া হয়। বর ও কনের নিজ-নিজ পরিবার, তাঁদের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবেরা এই উপহার সামগ্রী দেন। এ হচ্ছে সাধারণ চিত্র। অতি ধনী শ্রেণীতে, এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্মে সম্পত্তির হস্তান্তর বিয়েকে কেন্দ্র করে হয় না। বরং, দাদা-দাদী, নানা-নানী তাঁদের নাতি-নাতনীদের বিভিন্ন উপলক্ষ্যে – যেমন গ্রাজুয়েশন-এ, মূল্যবান উপহার (ডায়মন্ড, গাড়ী বা কটেজ) দেন।

সারাংশ

নৃবিজ্ঞানীরা চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে বিয়ে ব্যবস্থার শ্রেণীকরণ করেছেন: বিবাহ সঙ্গী নির্ধারণের ক্ষেত্রে গোত্রের গুরুত্ব, পতি-পত্নী সংখ্যা, পতি কিংবা পত্নীর ভাই/বোন বিবাহ সঙ্গী হতে পারে কি না, এবং বিবাহে মূল্যবান সামগ্রীর আদান-প্রদান। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, অপাশ্চাত্য সমাজগুলোর ভিন্নতা সত্ত্বেও বিয়ের বন্ধন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধন স্থাপন করে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য সমাজের ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থায়, বিয়ে হচ্ছে দুই ব্যক্তির মাঝে সম্পর্ক স্থাপন। তবে, মাথায় রাখা জরুরী যে, পাশ্চাত্য সমাজের প্রতিষ্ঠানাদি ও সংস্কৃতির প্রসার (ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে, উপনিবেশ-উত্তর সময়ে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে) অপাশ্চাত্যের সমাজে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তন বিয়ের সম্পর্ককে পুনর্গঠিত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উপরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। পতি-পত্নীর সংখ্যার মূলনীতির ভিত্তিতে বিয়েকে কয়টি শ্রেনীতে ভাগ করা যায়?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

২। নিচের কোন সমাজে “ধনুক দেয়ার” (giving the bow) অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়?
ক. টোডো খ. টিভ
গ. কুং! গ. সামোয়া

৩। নিচের কোন সমাজে কনে সেবার (bride service) - প্রচলন আছে?
ক. টিভ খ. আজটেক
গ. টোডো ঘ. কুং!

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নৃবিজ্ঞানীরা কিভাবে বিয়ে ব্যবস্থার শ্রেণীকরণ করেছেন?
২। কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অপাশ্চাত্য সমাজে বিয়ের সম্পর্ককে পুনর্গঠিত করেছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিয়ের শ্রেণীকরণের মূলনীতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২। অপাশ্চাত্য সমাজে বিয়ে হয় দুটি পক্ষের মধ্যে, দুটি ব্যক্তির মধ্যে নয়। এই বক্তব্য উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ - ৪

সাম্প্রতিককালের জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন
Contemporary Kinship Studies

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হাল আমলের চিন্তাভাবনা
- জ্ঞাতি বন্ধন অনুসন্ধানের বংশবৃত্তান্ত বা কুলুজি পদ্ধতি
- জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হাল আমলের চিন্তাভাবনা

এই পাঠটি জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের শেষ ইউনিটের শেষ পাঠ। আমরা এখন জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসব: জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা কি? যে সংজ্ঞা এবং পূর্বানুমানের ভিত্তিতে প্রায় দেড়শ' বছর ধরে জ্ঞাতিত্ব বিষয়ক গবেষণা কাজ পরিচালিত হয়েছে, জ্ঞাতি তত্ত্ব দাঁড় করান হয়েছে, জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন একটি বিশেষজ্ঞ জ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে, সেগুলো কি পর্যাপ্ত? সাম্প্রতিক কালের জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নরত বেশ কিছু নৃবিজ্ঞানী মনে করেন, এগুলো পর্যাপ্ত নয়। জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন ধাক্কা খেয়েছে নতুন প্রজনন প্রযুক্তির (new reproductive technology) কারণে। কিন্তু প্রযুক্তিগত আবিষ্কার, উদাহরণস্বরূপ – টেস্ট টিউবে সন্তান প্রসব, এবং আরও নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রসার, কেবলমাত্র একটি দিক। জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের ইতিহাস ঘেঁটে এই অধ্যয়ন সম্পর্কে মৌলিক কিছু জিজ্ঞাসা উত্থাপন করেছেন হাল আমলের নৃবিজ্ঞানীরা। জিজ্ঞাসাগুলোর কেন্দ্রে রয়েছে পাশ্চাত্য-অপাশ্চাত্যের অসম সম্পর্ক, পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্য, পাশ্চাত্যীয় সমাজের ধ্যান-ধারণা বাকী বিশ্বের মানদন্ড হয়ে উঠা, এবং খোদ নৃবিজ্ঞানের ভূমিকা। এ সকল কারণে, অনেকে মনে করেন জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে সংকট দেখা দিয়েছে এবং এই সংকট "জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন"র অস্তিত্বকে প্রশ্নসাপেক্ষ করে তুলেছে। ভবিষ্যতে নৃবিজ্ঞানের একটি বিশেষজ্ঞ জ্ঞান হিসেবে এটি আদৌ টিকে থাকতে পারবে কিনা, সে ব্যাপারে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আবার অনেক নৃবিজ্ঞানী আছেন যাঁরা বিষয়টিকে একেবারে ভিন্ন চোখে দেখেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, এই ধাক্কাগুলো জরুরী ছিল, এই জিজ্ঞাসাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে জ্ঞাতিত্বের বিষয়বস্তুকে পুনর্গঠিত করা উচিত। এর ফল, আগামীতে, অর্থবহ জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন এবং নৃবৈজ্ঞানিক অনুশীলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অনেকে মনে করেন জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে সংকট দেখা দিয়েছে এবং এই সংকট "জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন"র অস্তিত্বকে প্রশ্নসাপেক্ষ করে তুলেছে।

জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা এবং পূর্বানুমান প্রশ্নের সম্মুখীন

নৃবিজ্ঞানে এপর্যন্ত অনুশীলিত জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন চারটি পূর্বানুমানের উপর ভর করেছে। প্রথম তিনটি হ'ল :

পূর্বানুমান ১: *আদিম সমাজে জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে একটি মূলনীতি, সামাজিক জীবন জ্ঞাতি বন্ধন দ্বারা সংগঠিত*। নৃবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন, অধিকাংশ আদিম সমাজে বংশীয় দল জ্ঞাতি বন্ধনকে সংগঠিত করে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য সমাজে অপরাপর প্রতিষ্ঠান আছে (যেমন কর্মক্ষেত্র, রাষ্ট্র) যেগুলো সামাজিক জীবনের সাংগঠনিক মূলনীতি হিসেবে কাজ করে। আদিম সমাজের জ্ঞাতি ভিত্তিক দলের কাঠামো বুঝতে নৃবিজ্ঞানীরা 'বহির্বিবাহ' এবং 'বিনিময়'-এর ধারণার সাহায্য নিয়েছেন। তাঁদের মতে, বিয়ে একটি বিনিময় ব্যবস্থা এবং বহির্বিবাহের মাধ্যমে একটি বংশীয় দল অপর একটি বংশীয় দলের সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্ক স্থাপন, জ্ঞাতিভিত্তিক দলের পুনর্জন্ম নিশ্চিত করে।

পূর্বানুমান ১: আদিম সমাজে জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে একটি মূলনীতি, সামাজিক জীবন জ্ঞাতি বন্ধন দ্বারা সংগঠিত।

পূর্বানুমান ২: আদিম সমাজে জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র পরিসর।

পূর্বানুমান ২: *আদিম সমাজে জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র পরিসর*। বহু নৃবিজ্ঞানী (এবং মজার ব্যাপার হ'ল, তাঁরা বিরুদ্ধ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির) মার্কিনী নৃবিজ্ঞানী নেপোলিয়ান শ্যানো'র সাথে একমত হবেন যে, জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে আদিম সামাজিক কাঠামোর "প্রাণ"। নৃবিজ্ঞানীরা যেহেতু ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রতিটি আদিম সমাজে জ্ঞাতিত্ব নামক নির্দিষ্ট কিছু আছে, এবং এটি সকল আদিম সমাজের সাংগঠনিক

মূলনীতি, সে কারণে নৃবিজ্ঞানীদের মতে, বাস্তবিক অর্থে, প্রতিটি সমাজে জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র পরিসর (distinct domain)। এভাবে দেখার কারণে, কিছু নৃবিজ্ঞানীর মনে হয়েছে যে, আদিম সমাজের অপর তিনটি ক্ষেত্রঃ রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ধর্ম, গড়ে উঠে জ্ঞাতিত্ব বন্ধনের সাপেক্ষে। নৃবিজ্ঞানীদের সৃষ্ট এধরনের যুক্তি এবং ধ্যান-ধারণা, জ্ঞাতিত্বকে গড়ে তুলেছে আদিম সমাজের একটি কেন্দ্রীয় এবং “স্বতন্ত্র” পরিসর হিসেবে।

পূর্বানুমান ৩ঃ জ্ঞাতিত্ব মূলত কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, *জ্ঞাতিত্বের মূলে রয়েছে, মানুষের প্রজনন। প্রজনন হচ্ছে জৈবিক এবং প্রাকৃতিক*। প্রজনন হচ্ছে একটি সর্বজনীন সত্যঃ প্রতিটি সমাজে পেটে বাচ্চা আসা, মানুষের জন্ম গ্রহণ, বেড়ে ওঠা, এবং মৃত্যু, এগুলো ঘটে থাকে। শুধু ঘটে বললে চলবে না, একই প্রক্রিয়ায় ঘটে। এই বিষয়গুলো কেবলমাত্র সকল সমাজের জন্য সত্য নয়, একইভাবে সত্য। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, প্রজন্মের জৈবিকতা হচ্ছে জীববিজ্ঞানীদের “ক্ষেত্র”। জৈবিকতার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নির্মাণ হচ্ছে নৃবিজ্ঞানীদের কর্মক্ষেত্র (তাঁদের "field")। কিন্তু, প্রজনন যেহেতু মূলত জৈবিক, সে কারণে জৈবিকতা হচ্ছে মুখ্য (primary) এবং এর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নির্মাণ গৌণ (secondary)।

পূর্বানুমান ৩ঃ *জ্ঞাতিত্বের মূলে রয়েছে, মানুষের প্রজনন। প্রজনন হচ্ছে জৈবিক এবং প্রাকৃতিক।*

বিগত কয়েক দশকে নৃবিজ্ঞানে একটি মৌলিক বদল ঘটেছে, এই বদল অন্যান্য জ্ঞানকান্ডেও দেখা গেছে। বদলটি তত্ত্ব এবং জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology), দুটোকেই কেন্দ্র করে ঘটেছে। জটিল প্রসঙ্গে না ঢুকে, সহজভাবে বললে, এই বদলের কারণে মূলত দুই ধরনের পুনর্বিবেচনা করা চলে। এক, জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন যে সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যেমন, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, পরিবার গঠন ইত্যাদি, এসব বিষয়কে নতুন প্রত্যয়নের সাহায্যে পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। এর কিছু নমুনা আপনি এ পর্যন্ত উপস্থাপিত পাঠ সমূহে পেয়েছেন (উদাহরণস্বরূপ, ডেভিডফ এবং হল্‌, হিলারি স্ট্যান্ডিং, এবং রায়না র‍্যাপের লিঙ্গ ও শ্রেণীর অন্তর্প্রবিষ্টতা সম্পর্কিত আলোচনা)। দুই, আরও মৌলিক বিষয় প্রসঙ্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে। সেগুলো হলঃ জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের মূলনীতি, মূলনীতি গড়ে উঠার ইতিহাস, মূলনীতি এবং পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিকতা, মাঠ-গবেষণা পদ্ধতি, পদ্ধতি ও উৎপাদিত জ্ঞানের সম্পর্ক ইত্যাদি।

জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে কিছু বদল ধীরে ধীরে ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশক থেকে শুরু হতে থাকে। প্রথম একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী জ্যাক গুডি। তিনি প্রস্তাব করেন যে, জ্ঞাতি দলকে কাঠামো হিসেবে না দেখে এটিকে একটি *প্রক্রিয়া* হিসেবে দেখা উচিত। তাঁর বিবেচনায়, গৃহস্থালী গঠন একটি কাঠামো নয়, এটি একটি বিকাশমান প্রক্রিয়া। কিছুদিন পর, জ্যাক গুডি, এডমান্ড লীচ এবং আরও কিছু নৃবিজ্ঞানী জ্ঞাতিত্বকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার প্রবণতার সমালোচনা দাঁড় করান। অজাচারের আলোচনা প্রসঙ্গে গুডি বলেন, অজাচারকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে, এটিকে স্থাপন করা উচিত বিষমকামী (heterosexual) সম্পর্কের *সামগ্রিক* পরিসরে যেখানে অজাচার অন্যান্য যৌন অপরাধের (যেমন ব্যভিচার, অবিবাহিত নারী-পুরুষের যৌন মিলন ইত্যাদি) মধ্যে একটি। একই ধারার পরামর্শ নৃবিজ্ঞানী রিভিয়ের বিয়ে প্রসঙ্গে দেন। তাঁর মতে, বিয়েকে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে স্থাপন করা উচিত। তিনি মনে করেন, বিয়েকে দেখা উচিত সমাজে নারী ও পুরুষের সামগ্রিক সম্পর্কের একটি দিক হিসেবে। বিয়ে হচ্ছে, তাঁর দৃষ্টিতে বিদ্যমান লিঙ্গীয় সম্পর্কের একটি ফলাফল মাত্র।

বৃহত্তর প্রেক্ষিতে স্থাপন করার এই উদীয়মান ধারা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে লীচের শ্রীলংকার কাজের কারণে। গুডি এবং রিভিয়ের যেখানে অজাচার এবং বিয়েকে সামগ্রিক লিঙ্গীয় সম্পর্কে স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, সেখানে লীচের বক্তব্য ছিল আরও দ্বিধাহীন। তিনি বলেন, “ভূমি এবং সম্পত্তির বাইরে জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার ভিন্ন কোন অস্তিত্ব নেই”। পরবর্তীকালে, একই ধরনের বিশ্লেষণ ফরাসী কাঠামোবাদী মার্ক্সবাদী যেমন ইম্যানুয়েল টেরে, ক্লদ মেয়াসুর কাজের সাহায্যে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। টেরে এবং মেয়াসু জ্ঞাতিত্বকে দেখেন রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি অংশ হিসেবে। নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীদের কাজের জোয়ার আরম্ভ হয় ১৯৬০-এর শেষ এবং ১৯৭০-এর প্রথম দিকে। এটি এখনও চলমান। নারীবাদীরা জ্ঞাতিত্বকে বৃহত্তর লিঙ্গীয় সম্পর্কের বাইরে দেখতে রাজি নন; সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা লিঙ্গীয় সম্পর্কের সাথে যুক্ত করেছেন শ্রেণীগত সম্পর্ক (উদাহরণস্বরূপ রায়না র‍্যাপ, হিলারী স্ট্যান্ডিং)। কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদী অবস্থান থেকে লিঙ্গ, শ্রেণী এবং নরবর্ণ – বৈষম্যের এই তিন

প্রধান মূলনীতির *অন্তর্প্রবিষ্টতা* অনুসন্ধান করা প্রয়োজনীয়। জ্ঞাতিত্বের স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক অসন্তোষের সুরাহা লীচ একভাবে করেছিলেন। ফরাসী কাঠামোবাদী মার্ক্সবাদী মেয়াসু এবং টেরে করেছিলেন আরেকভাবে। তাত্ত্বিক এই অসন্তোষকে আরও উচ্চতর জায়গায় ঠেলে দিলেন মার্কিন নৃবিজ্ঞানী ডেভিড শ্নাইডার। তিনি বলেন, জ্ঞাতিত্বকে স্থাপন করতে হবে সামগ্রিক "সংস্কৃতির" প্রেক্ষিতে। শ্নাইডারের দৃষ্টিতে এটি জরুরী কারণ তা না হলে আমাদের পক্ষে সংস্কৃতির সামগ্রিক বিন্যাস বোঝা সম্ভব হবে না।

"কাঠামো"র পরিবর্তে জ্ঞাতিত্বকে সমাজ জীবনের একটি "প্রক্রিয়া" হিসেবে বিবেচনা করার কারণে নতুন ধরনের গবেষণা কাজ ও লেখালেখি আরম্ভ হয়। পুরোনো দৃষ্টিতে গবেষণার বিষয় হত পরিবারের কাঠামো এবং এটির ভূমিকা। নতুন দৃষ্টিতে ভিন্ন ধরনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল: পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া, এ প্রক্রিয়ায় পরিবার ও জ্ঞাতি দল বাদে আর কোন কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যুক্ত, সামাজিক প্রতিষ্ঠান কি উপায়ে পুনরুৎপাদনকে সংগঠিত করে ইত্যাদি। পূর্বে নৃবিজ্ঞানীরা যেখানে অর্থনীতিকে প্রত্যয়ন করতেন একটি "ব্যবস্থা" হিসেবে, নতুন ধারণায়নের ফলে নৃবিজ্ঞানীরা এটিকে দেখা আরম্ভ করলেন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে (উদাহরণস্বরূপ, হিলারি স্ট্যান্ডিং)। প্রথাগত নৃবৈজ্ঞানিক কাজে সচরাচর এধরনের জিজ্ঞাসা দেখা যেত: অমুক সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জ্ঞাতি এবং বংশীয় দলের ভূমিকা কি? উৎপাদন এবং বিনিময় প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে নতুন ধারার কাজে নৃবিজ্ঞানীরা জিজ্ঞাসা তোলেন জ্ঞাতি ও বংশীয় দল, এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান, কিভাবে এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত। কোন একটি সমাজের "জ্ঞাতি ব্যবস্থা"র প্রতি মনোনিবেশ করার পরিবর্তে নতুন ধারার কাজে রত নৃবিজ্ঞানীরা জ্ঞাতিত্বকে তাদের কাজে অন্তর্ভুক্ত করছেন। ধরুন, যিনি কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী রূপান্তর নিয়ে কাজ করছেন, তিনি জ্ঞাতি বন্ধন কিভাবে এই রূপান্তরের ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে সেটির উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন।

জ্ঞাতিত্বকে সামাজিক জীবনের অংশ হিসেবে দেখার কারণে খোদ জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের চেহারা বদলে গেছে। পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বের জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের বই শুধুমাত্র জ্ঞাতিত্বের চার্ট, ডায়াগ্রাম, ছকে পরিপূর্ণ থাকত ("জ্ঞাতি বীজগণিত")। সাম্প্রতিককালের জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন যেহেতু টেকনিকেল না (নিয়ম-ব্যবস্থা, পদাবলী ব্যবস্থা) সে কারণে বইগুলো হয় আরও আলোচনা-ভিত্তিক।

জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা এবং পূর্বানুমান : পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা?

জ্ঞাতিত্বের তাত্ত্বিক পূর্বানুমান প্রসঙ্গে যে আলোচনা পূর্বের অংশে ছিল, সেটি ছিল প্রধানত জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের প্রত্যয় নিয়ে ("কাঠামো" বনাম "প্রক্রিয়া", "স্বতন্ত্র পরিসর" বনাম "সমগ্র")। এখন আরেকটি কেন্দ্রীয় পূর্বানুমান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে; এই পূর্বানুমান নিয়ে যে সমালোচনা উঠেছে সেটি জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের ভিত্তিকে মৌলিকভাবে ধাক্কা দিয়েছে।

পূর্বানুমান ৪: রক্তের সম্পর্ক মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করে: রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়রা এক দলে, যাঁরা রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় নন তাঁরা অন্য দলে। প্রজনন হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক সত্য। প্রজননের প্রাকৃতিক সত্যতা প্রকাশের ভাষা হচ্ছে: আমরা "একই" রক্তের, "ওর আপন চাচা". "আমার নিজের মা"। একটি শিশু জন্মগ্রহণ করার পরপরই কিংবা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, শিশুটি গর্ভে আসার মুহূর্ত থেকেই তার "আসল" আত্মীয় কারা তা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুটি পালক হলেও, "আসল" বাবা, মা, ভাই, বোনের ধারণা কার্যকরী যেহেতু, রক্ত সম্পর্ক হচ্ছে জ্ঞাতিত্বের ভিত্তি, এবং সেটি "আসল"। *জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে রক্তে অংশীদারিত্বের ব্যাপার; কারা একই রক্তের তা গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে প্রতিষ্ঠিত; প্রতিষ্ঠিত এই সত্যটি অপরিবর্তনীয়* (আমার "আসল" বাবা চিরদিনের জন্য আমার "আসল" বাবা)। জ্ঞাতি তত্ত্ব এসব পূর্বানুমানের উপর দাঁড়িয়ে। নৃবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন যে, এই ধারণাগুলো সকল সমাজের জন্য, সকল মানুষের জন্য সত্য। আরও ধরে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু এগুলি প্রাকৃতিক সত্য (এর কোন নড়চড় নেই), সে কারণে বিভিন্ন সমাজে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নির্মাণগুলোকে এই সত্য সাপেক্ষে বিচার বিশ্লেষণ করা হবে।

পর্বানুমান ৪ : জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে রক্তে অংশীদারিত্বের ব্যাপার; কারা একই রক্তের তা গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে প্রতিষ্ঠিত; প্রতিষ্ঠিত এই সত্যটি অপরিবর্তনীয়।

সত্য-অসত্যের এই ধারণা নৃবিজ্ঞানে ছিল মজ্জাগত। এবং এগুলো প্রোথিত ছিল বৃহত্তর একটি পরিকাঠামোতে : আদিম সমাজ হচ্ছে অযৌক্তিক, অনুভূতিপ্রবণ, ঐতিহ্যবাহী, ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজ হচ্ছে যুক্তি নির্ভর, আলোকময় (enlightened), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর। হাল আমলের নৃবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই কারণে নৃবিজ্ঞানে প্রায় শ' খানেক বছর ধরে বিবর্তনবাদের "পিতৃত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা"র ধারণা শক্তিমত্তা অর্জন করে। মর্গান এবং আরও বহু নৃবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন যে, আদিম সমাজে পিতৃ পরিচয় জানা ছিল না। কেবল মাত্র মায়ের পরিচয় নিশ্চিত ছিল যেহেতু তিনি গর্ভধারিণী এবং প্রসবকারী। বিবর্তনবাদীদের বক্তব্য ছিল, বিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায়ে সন্তান প্রজননে পিতার শরীরী ভূমিকা সম্বন্ধে জ্ঞান তৈরী হয়। এই ব্যাখ্যার তীব্র সমালোচনা প্রথমে তোলেন লীচ, ১৯৬৮ সালের একটি প্রবন্ধে। খ্রিস্টীয় ধর্মে "কুমারী মাতা"র ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, সন্তান প্রজননে পিতার ভূমিকার অস্বীকৃতিকে নৃবিজ্ঞানীদের "অজ্ঞানতা" হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং, তাঁদের প্রশ্ন করতে পারা উচিত কেন বিশেষ বিশেষ সমাজে এই তথ্যটি গুরুত্বহীন অথবা অপ্রাসঙ্গিক।

সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানীদের বিবেচনায়, এই কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক পূর্বানুমান হচ্ছে পাশ্চাত্যীয়। নৃবিজ্ঞানী মেইগস ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, জনপ্রিয় মার্কিন দৃষ্টিতে গর্ভধারণের মুহূর্ত হতে জ্ঞাতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে "আসল" জ্ঞাতি কে তা পূর্ব-নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। "আপন" বাবা শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে এই মতাদর্শে জৈবিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন সংস্কৃতিতে বংশবৃত্তান্ত বা কুলুজীর ব্যাপারে রয়েছে মুগ্ধতা এবং অধিক আগ্রহ। মেইগস লেখেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বইয়ের দোকানগুলোতে বর্তমানে অন্তত ৫০টি নিজ কুলুজি তৈরী করার গাইড বই পাওয়া যাবে। পালিত সন্তানদের "নিজ"র বাবা-মা সন্ধান করার যে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো, তা মেইগসের মতে, "আসল" জ্ঞাতি বন্ধন যে জন্ম হতে নির্ধারিত, এই ধারণার শক্তিমত্তা প্রমাণ করে। এই মতাদর্শ মতে, জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে রক্তে অংশীদারিত্বের ব্যাপার। একই রক্ত হওয়ার সূত্রে যে বন্ধন তা, মার্কিন মতাদর্শে, অপরিবর্তনীয় এবং চিরকালের জন্য।

মার্কিন মতাদর্শ পাশ্চাত্যীয় মতাদর্শের অংশ। কিছু নৃবিজ্ঞানী মনে করেন যে, পাশ্চাত্যীয় স্বাভাবিকত্বের ধারণা জ্ঞাতিত্বের ধারণায়নকে প্রভাবিত করেছে। জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের মাঠ গবেষণা পদ্ধতি এই মতাদর্শকে ধারণ করে। এবং, এই গবেষণা পদ্ধতির অনুসরণ, অপাশ্চাত্য সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কের বিবিধতাকে কেবলমাত্র অস্বীকার করেনি, পাশ্চাত্যীয় ধ্যান-ধারণা কে অপাশ্চাত্য সমাজে আরোপন করছে।

জ্ঞাতিত্ব অনুসন্ধান পদ্ধতি: জ্ঞাতি বন্ধন অনুসন্ধানের বংশবৃত্তান্ত বা কুলুজি পদ্ধতি (genealogical method) নৃবিজ্ঞানী রিভার্স উদ্ভূত। তিনি এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন ১৮৯৮-১৮৯৯ সালের টরেস স্ট্রেইটস অভিযানে। পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নবিজ্ঞানের মত একটি নির্ভুল জ্ঞান হিসেবে জাতিতত্ত্বকে (প্রথম দিকে নৃবিজ্ঞান এই নামে পরিচিত ছিল) প্রতিষ্ঠিত করা এই পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল। নৃবিজ্ঞানী বুকে'র মতে, এই পদ্ধতি ইংরেজ সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে দাঁড় করানো হয়। রিভার্স তাঁর *নোটস এ্যান্ড কোওয়েরিজ ইন এ্যান্থ্রোপলজি* বইয়ের চতুর্থ সংস্করণে (১৯১২) এই পদ্ধতির বর্ণনা দেন। এটিতে কুলুজি অনুসন্ধানরত মাঠ গবেষককে গবেষণার প্রতিটি ধাপের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়। গবেষককে প্রথম যে নির্দেশ দেয়া হয় তা হ'ল, তথ্যদাতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তিনি যে নারীর গর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর নাম। দ্বিতীয়ত, তথ্যদাতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তাঁর জৈবিক পিতার নাম। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষকের জেনে নিতে হবে তথ্যদাতার ভাই ও বোনের নাম, তাঁর বাবা ও মার ভাই ও বোনদের নাম-ধাম, বয়স ইত্যাদি। এগুলো টুকে নেয়ার পর গবেষক তথ্যদাতার কাছ থেকে জানতে চাইবেন তিনি তার জৈবিক পিতা ও মাতাকে, ভাই ও বোনদের, কিভাবে সম্বোধন করেন। এই তথ্যগুলিও টুকে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয় গবেষককে। রিভার্স গবেষককে দেশীয় জ্ঞাতি পদ জেনে নিতে উৎসাহ প্রদান করেন ঠিকই কিন্তু সতর্ক করেন যাতে সকল তথ্য (পাশ্চাত্যীয় জ্ঞাতিত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করে) জোগাড় করার পর সে প্রচেষ্টা চালানো হয়।

বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান উৎপাদন করা ছিল বংশবৃত্তান্ত বা কুলুজি পদ্ধতির উদ্দেশ্য।

রিভার্সের কুলুজি পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী বারনার্ড এবং গুড বলেন, বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান উৎপাদন করা ছিল বংশবৃত্তান্ত বা কুলুজি পদ্ধতির উদ্দেশ্য। রিভার্স (এবং পরবর্তী প্রজন্মের নৃবিজ্ঞানীগণ) গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তথ্যের মানসম্পন্ন লিপিকরণের উপর, মাঠ গবেষককে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তিনি ভুল-ভাল তথ্য বাদ দেন, সাক্ষাতকারে প্রাপ্ত তথ্যকে সত্যায়িত করেন, এবং বিভিন্ন তথ্যদাতাদের বক্তব্য জড়ো করে একটি সমন্বিত চিত্র দাঁড় করান। বুকে উল্লেখ করেন, কুলুজি পদ্ধতি অনুসারীদের প্রতি নির্দেশ ছিল, সংগৃহীত তথ্য যাতে তুলনাযোগ্য হয়। তুলনা তখনই করা সম্ভব, বুকের মতে, যখন স্থানিক ভাষাকে একটি মানসম্পন্ন বৈশ্বিক প্রকাশভঙ্গিতে অনুবাদ করা হয়। বুকে এই পদ্ধতির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে বলেনঃ মা যেহেতু বিশ্বের সকল সমাজে সন্তান প্রসব করেন, কোন না কোন ব্যক্তি যেহেতু সকল সমাজে বাবা হিসেবে চিহ্নিত হন, সে কারণে সকল সমাজের মানুষের কুলুজি যোগাড় করা, তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পাশ্চাত্য সমাজে পিতা, মাতা এবং সন্তানদের মধ্যকার সম্পর্ককে যে ধরনের গুরুত্ব দেয়া হয়, ঠিক একই ধরনের গুরুত্ব অপাশ্চাত্য সমাজেও দেয়া হয়। বুকে আরও বলেন, জ্ঞাতি বন্ধনের তথ্য এই পদ্ধতিতে যোগাড় করার ফলে পাশ্চাত্য সমাজের জ্ঞাতিত্বের ধারণা (রক্ত, বংশ, কুল) অপাশ্চাত্য সমাজে আরোপিত হয়। এই আলোচনা প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী লাডিস্- াভ হলি মার্গারেট মীডের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। মার্গারেট মীড সামোয়া দ্বীপে মাঠ গবেষণা করার সময় লক্ষ্য করেন যে, রিভার্সের কুলুজি পদ্ধতি অনুসরণ করলে সামোয়া দ্বীপবাসীরা এক ধরনের তথ্য দেন। মীড তাদের প্ররোচিত না করলে তারা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে খুব ভিন্নভাবে তুলে ধরেন।

এ কারণে হলি অভিমত প্রকাশ করেন যে, বংশবৃত্তান্ত পদ্ধতি জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক অনুসন্ধানে বংশ বা কুলকেই গুরুত্ব দেয়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে জ্ঞাতিত্ব কি তা জানার পরিবর্তে, জ্ঞাতিত্ব কি হওয়া উচিত সেটি জানা যায়।

ইয়াপ্ সমাজে জ্ঞাতিত্বঃ মার্কিন নৃবিজ্ঞানী ডেভিড শ্নাইডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট ক্যারোলায়না দ্বীপে ইয়াপ্ নামক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করেছেন। ইয়াপ্‌রা কেবলমাত্র আচার-অনুষ্ঠান পালনের সময় জ্ঞাতি সম্বোধন ব্যবহার করেন। এ বাদে, বাকী সময়ে তারা একে অপরকে নাম ধরে ডাকেন, এমন কি বাবা, মাকেও। কিন্তু একজন ইয়াপ্-এর কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় যে নারী তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, অথবা যে পুরুষ তার জনক, তাদের কি নামে সে সম্বোধন করে, তখন সেই ইয়াপটি্ উত্তর দেবেন, **সিটিনিঙ্গেন** এবং **সিটামাঙ্গেন**। তিনি আরও বলবেন যে, যারা ওর সিটিনিঙ্গেন এবং সিটামাঙ্গেন ও নিজে তাদের **ফাক**। শুধুমাত্র তার বাবা নয়, তার বাবার ভাইয়েরা এবং তাদের চাচাত ভাইয়েরাও তার সিটামাঙ্গেন। সিটিনিঙ্গেন-এর ক্ষেত্রেও তাই। শ্নাইডার বলেন, এ ধরনের রীতি বহু সমাজে প্রচলিত, ইয়াপ্‌দের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ জিনিস দেখা যায়। পদ দুটি কেবলমাত্র যারা জীবিত তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং একজনের শুধুমাত্র একজন সিটিনিঙ্গেন এবং সিটামাঙ্গেন থাকতে পারে, তার বেশি নয়। পিতা বেঁচে থাকলে শুধু তিনি হন সিটামাঙ্গেন, তার মৃত্যুর পর তার ভাই অথবা চাচাত ভাইদের থেকে একজন হন সেই মানুষটির সিটামাঙ্গেন। মায়ের বেলাতেও একই নিয়ম কাজ করে।

ইয়াপ্‌দের কাছে সিটামাঙ্গেন এবং ফাক বোঝায় নির্ভরশীলতা এবং কর্তৃত্বের সম্পর্ক। বাল্যকালে ফাকদের লালন পালন করার দায়িত্ব সিটিনিঙ্গেন-এর; ফাক যখন বড় হয় তার দায়িত্ব হচ্ছে সিটামাঙ্গেন-এর দেখাশোনা করা। সাধারণত, একজন নারীর স্বামী হচ্ছে তার সন্তানের সিটামাঙ্গেন, এবং সন্তানেরা হচ্ছে তার ফাক। নারীর স্বামীটি যখন বুড়ো এবং অথর্ব হয়ে যান, তখন তার ফাক হয়ে যায় তার সিটামাঙ্গেন। এই সিটামাঙ্গেন-ফাক সম্পর্ক অন্যদের মধ্যেও গড়ে উঠতে পারে। যদি নারীর স্বামীর দেখাশোনা তার পুত্র না করে তাহলে সেই দায়িত্ব অন্য কোন পুরুষের পক্ষে পালন করা সম্ভব। তিনি তখন হয়ে যান বুড়োটির ফাক। এমন যদি ঘটে, তাহলে নারীর পুত্র সন্তান তাদের বাড়ি/ঘর/ভূমি/সংসারে (tabinau) তার অধিকার হারায়। অধিকার পান তিনি যিনি বৃদ্ধের দেখাশোনা করেন, অবশ্য তার মৃত্যুর পরে।

শ্নাইডার বলেন, সিটিনিঙ্গেন এবং সিটামাঙ্গেন স্পষ্টতই কোন দশাকে (state) বোঝায় না। বরং, এগুলো ভূমিকা পালনের স্মারক। স্বাভাবিক অবস্থায়, একজন বিবাহিত নারী তার গর্ভজাত সন্তানের

পাশ্চাত্য ধারণায় জ্ঞাতি
বাংশ বলতে বোঝায়

সিটিনিঙ্গেন। কিন্তু যদি তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে তাহলে তিনি চলে যান তার নিজের, সিটিনিঙ্গেন এবং সিটামাঙ্গেন-এর কাছে এবং তাকে আর তার সন্তানের সিটিনিঙ্গেন হিসেবে দেখা হয় না। সন্তানদের বাবা যদি আবার বিয়ে করেন তাহলে তার নতুন স্ত্রী হন সন্তানদের সিটিনিঙ্গেন। যদি তিনি বিয়ে না করেন তাহলে স্বামীর বোন হন ভাইয়ের সন্তানদের সিটিনিঙ্গেন। শ্লাইডারের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে যে, সিটামাঙ্গেন-ফাক, সিটিনিঙ্গেন-ফাক সম্পর্কে দশার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ক্রিয়াকর্ম। এই সম্পর্ক গঠনের ভিত্তি হচ্ছে একজন ফাক তার সিটামাঙ্গেনএর জন্য কি করে এবং একজন সিটামাঙ্গেন তার ফাক-এর জন্য কি করে, সেটা। ইয়াপ্ ধারণাকে শ্লাইডার পাশ্চাত্য ধারণার সাথে তুলনা করে বলেন, পাশ্চাত্য ধারণায় জ্ঞাতিত্ব এবং বংশ বলতে বোঝায় কিছু অন্তর্নিহিত গুণাবলী। এবং এই অর্থে ইয়াপ্ ধারণা পাশ্চাত্য ধারণার বিপরীত কারণ ইয়াপ্রা গুরুত্ব দেন ক্রিয়ার উপর, দশার উপর না। তিনি আরও বলেন, কুলুজি বা বংশবৃত্তান্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে নৃবিজ্ঞানীরা পাশ্চাত্যীয় ধারণা অন্য সকল মানুষের উপর আরোপন করেছেন। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে, জ্ঞাতিত্বের মূলে রয়েছে প্রজনন প্রক্রিয়া, যা কিনা রক্তসূত্রীয় বন্ধনের সূত্রপাত ঘটায় এবং এটি সমভাবে বিশ্বের সকল সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সারাংশ

জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে নৃবিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। এই কেন্দ্রিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় নৃবিজ্ঞানের শুরু থেকে। সাম্প্রতিককালের নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, “আদিম” এবং “সভ্য” হিসেবে বিশ্বের সকল সমাজের দ্বিবিভাজন এই কেন্দ্রিকতার কারণ। বিংশ শতকের শেষ ভাগে জ্ঞাতিত্বের কিছু কেন্দ্রীয় মূলনীতি যথা, (ক) জ্ঞাতিত্ব আদিম সমাজের সামাজিক জীবনকে সংগঠিত করে (খ) জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র পরিসর এবং (গ) জ্ঞাতিত্বের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের প্রজনন। প্রজনন হচ্ছে জৈবিক এবং প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ – প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। নতুন ধারণায়নের প্রেক্ষিতে জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে খুব ভিন্ন ঢংয়ের গবেষণা কাজ ও লেখালেখি তৈরি হয়। আরও সাম্প্রতিককালে, ১৯৯০-এর দশকে, পাশ্চাত্য-অপাশ্চাত্যের অসম সম্পর্ক এবং পাশ্চাত্য বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্য এই দুইটি প্রসঙ্গ জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের ক্ষেত্রকে আরও মৌলিকভাবে নাড়া দেয়। এতে জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের ভিত্তিপ্রস্তর ধাক্কা খায়। নতুন তাত্ত্বিক উদ্ভাবনের আলোকে নৃবিজ্ঞানীরা যুক্তি হাজির করেন যে, জ্ঞাতিত্বের সর্বজনীন সংজ্ঞা: জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে রক্তে অংশীদারিত্বের ব্যাপার, কারা একই রক্তের তা গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে প্রতিষ্ঠিত – এই সত্যটি আসলে সর্বজনীন নয়, এটি পাশ্চাত্যীয়। নৃবিজ্ঞানীরা তাঁদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই ধারণা অপাশ্চাত্য সমাজে আরোপ করে। এই সমালোচনা জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের পাটাতনে আঘাত হানে। আঘাতে নতুন মাত্রা যুক্ত করে নতুন প্রজনন প্রযুক্তি। অনেকে মনে করেন, জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের ভবিষ্যত নেই। পক্ষান্তরে, কিছু নৃবিজ্ঞানীর ধারণা, জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের জ্ঞানের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরী ছিল এবং বর্তমানে যে ধরনের তাত্ত্বিক পুনর্মূল্যায়ন চলছে সেগুলো আগামীতে অর্থবহ এবং প্রাসঙ্গিক কাজের জন্ম দেবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। নিচের কোন নৃবিজ্ঞানী প্রস্তাব করেন যে, জ্ঞাতি দলকে কাঠামো হিসেবে না দেখে এটিকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা উচিত।

ক. জ্যাক গুডি | খ. এইচ.আর রিভার্স
গ. ফার্ডিনান্দ সস্যুঘ | ঘ. উপরের কেউ নন

২। জ্ঞাতি বন্ধন অনুসন্ধানে বংশবৃত্তান্ত বা কুলুজি পদ্ধতিটি কে আবিষ্কার করেন?

ক. এইচ.আর. রিভার্স | খ. ভিক্টর টার্নার
গ. মার্গারেট মীড | ঘ. মেরী ওগলাস

৩। নিচের কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠী কেবলমাত্র আচার-অনুষ্ঠান পালনের সময় জ্ঞাতি সম্বোধন ব্যবহার করেন?

ক. ইয়াপ্ | খ. টিভ
গ. দবু | ঘ. টোডো

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের চারটি তাত্ত্বিক পূর্বানুমান সংক্ষেপে তুলে ধরুন।
২। বংশবৃত্তান্ত বা কুলুজি পদ্ধতি কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা এবং পূর্বানুমান কি কি ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তা আলোচনা করুন।
২। সাম্প্রতিককালের নৃবিজ্ঞানীরা বলছেন, জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা পাশ্চাত্যীয়। ইয়াপ্ সমাজে জ্ঞাতিত্বের যে ধারণা তার সাথে তুলনা করে এই পাশ্চাত্যীয় ভিত্তি স্পষ্ট করুন।